তৈনগাঙ
Toingang

তৈন্‌গাঙ

আন্তর্জাতিক আদিবাসী দিবস সংখ্যা-২০০৮

Toingang

Celebration of the UN International Day of the
World's Indigenous Peoples
August 9, 2008

সম্পাদক
Editor
অছ্য কুমার তঞ্চঙ্গ্যা
Achya Kumar Tangchangya

প্রকাশনায়
তৈন্‌গাঙ লিটারেচার ফোরাম, ঢাকা, বাংলাদেশ

Published by
Toingang Literature Forum, Dhaka, Bangladesh
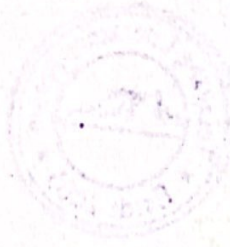
সম্পাদনা পরিষদ

জ্যোতি বিকাশ তঞ্চঙ্গ্যা

অমিত তঞ্চঙ্গ্যা

হরি কিশোর তঞ্চঙ্গ্যা

সদস্য ও সদস্যাবৃন্দ

শান্ত রক্ষিত তঞ্চঙ্গ্যা
আনন্দ তঞ্চঙ্গ্যা
জগদীশ তঞ্চঙ্গ্যা
শ্রীজ্ঞান তঞ্চঙ্গ্যা

বিশাখা তঞ্চঙ্গ্যা
সুজন্ত তঞ্চঙ্গ্যা
জনমজয় তঞ্চঙ্গ্যা
রূপা তঞ্চঙ্গ্যা

বিশেষ সহযোগিতায় ঃ মৃণাল কান্তি তঞ্চঙ্গ্যা
কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন ঃ ড. মুস্তাফা মজিদ, কবি ও গবেষক এবং
মহাব্যবস্থাপক, বাংলাদেশ ব্যাংক, ঢাকা

প্রকাশকাল ঃ আন্তর্জাতিক আদিবাসী দিবস, আগস্ট ৯, ২০০৮
প্রচ্ছদ ঃ ড. মুস্তাফা মজিদের তোলা তঞ্চঙ্গ্যাদের আলোকচিত্র অবলম্বনে
শিল্পী সৈয়দ লুৎফুল হক

বর্ণসজ্জা ঃ সৈয়দ মাসুদ, মহুয়া মহসীন ও নূরুন্নাহার
মুদ্রণে ঃ হাবিব প্রেস লিমিটেড, ৯ নবরায় লেন, ইসলামপুর, ঢাকা-১১০০

যোগাযোগ ঃ ৪৬৫ জগন্নাথ হল, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা-১০০০
Contact : 465 Jagannath Hall, Dhaka University, Dhaka-1000
E-mail: toin_gang@yahoo.com, achya_tang@yahoo.com

মূল্য ঃ ৪০.০০ টাকা, শুভেচ্ছা মূল্য ঃ ১০০.০০টাকা

সম্পাদকীয়

আজ ৯ই আগস্ট, ২০০৮ জাতিসংঘ ঘোষিত আন্তর্জাতিক আদিবাসী দিবস। পৃথিবীর আদিবাসী তথা নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠীর একটি উল্লেখযোগ্য দিন। বিশ্বের ৭০টিরও বেশি দেশে অবস্থানরত ৩৭০ মিলিয়নের বেশি আদিবাসী লোকজনের এক ঐতিহাসিক স্মরণীয় দিন এটি। এই দিনটি আদিবাসীদের মনে রোমন্থন করে দেয় তাদের অতীত সুখ-দুঃখের স্মৃতি, অধিকার-জীবন সংগ্রামের স্মৃতি, ইতিহাস-ঐতিহ্য ও নিজস্ব সংস্কৃতির স্মৃতি। আবার এই দিনে তারা অনুভব করে তাদের ঐক্যর সুর, সম্ভাবনাময় আগামীর। তাই আদিবাসী দিবস আদিবাসীদের জীবনে এনে দেয় নতুন প্রাণচাঞ্চল্য।

বিশ্বের অন্যান্য দেশের আদিবাসীদের মত বাংলাদেশেও ৪৫টির অধিক আদিবাসী জনগোষ্ঠীর রয়েছে নিজস্ব সংস্কৃতি এবং জীবন পদ্ধতি। তাই নিঃসন্দেহে এই দিনটি এদেশের আদিবাসীদের কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। দেশের বৃহৎ জনগোষ্ঠীর সাথে ভ্রাতৃত্বের বন্ধন বজায় রেখে তারাও স্বপ্ন দেখে এগিয়ে যাবার।

১৪তম আন্তর্জাতিক আদিবাসী দিবস স্মরণানুষ্ঠানকালে **তৈন্‌গাঙ লিটারেচার ফোরাম** এর তৈন্‌গাঙ প্রকাশনাটি এবারও ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ হলো। এ প্রকাশনায় যাঁরা নানাভাবে সহযোগিতা প্রদান করেছেন আমরা তাঁদের প্রত্যেকের কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। অনেকে লেখা পাঠিয়েছেন, আমার নানা সীমাবদ্ধতার কারণে তা সব ছাপানো সম্ভব হয়নি বলে আমরা আন্তরিকভাবে দুঃখিত। আর পরিপক্ক জ্ঞান ও কর্মদক্ষতার অভাবের ফলে অনাকাঙ্ক্ষিত ভুল-ত্রুটি থাকা অস্বাভাবিক কিছু নয়। তার জন্য আমরা সুধীজনের কাছে ক্ষমাপ্রার্থী এবং পরামর্শ কামনা করছি। এরপরও তৈন্‌গাঙ যদি পাঠকের মননশীল চেতনাকে সামান্যতম স্পর্শ করে তবে আমাদের শ্রম সার্থক।

পরিশেষে, পৃথিবীর সকল আদিবাসী তাদের ন্যায্য অধিকার, গৌরবোজ্বল ইতিহাস ও নিজ নিজ ঐতিহ্য নিয়ে বেঁচে থাকুক এবং আগামীর পথে এগিয়ে যাক তাদের বৈচিত্র্যময় সংস্কৃতি নিয়ে– আন্তর্জাতিক আদিবাসী দিবস পালনের প্রাক্কালে এটাই হোক আমাদের সবার কামনা। আদিবাসী দিবস সফল হোক এবং সবাইকে আদিবাসী দিবসের উষ্ণ শুভেচ্ছা।

অছ্য কুমার তঞ্চঙ্গ্যা
আন্তর্জাতিক আদিবাসী দিবস–২০০৮

তৈন্গাঙ এবং তৈনগাঙ লিটারেচার ফোরাম-কে এগিয়ে যেতে যাঁরা আর্থিক, শ্রম, পরামর্শ ও নানাভাবে সহযোগিতা করেছেন আমরা তাঁদের নিকট কৃতজ্ঞ

* **জ্ঞান রঞ্জন তঞ্চঙ্গ্যা**, প্রধান শিক্ষক, বান্দরবান সরকারি উচ্চ বিদ্যালয় ও জেলা শিক্ষা কর্মকর্তা, বান্দরবান।
* **প্রসন্ন কান্তি তঞ্চঙ্গ্যা**, বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ ও সামাজসেবী, বান্দরবান।
* **প্রকৌ. দীপ্তিময় তঞ্চঙ্গ্যা**, ডিরেক্টর(টেকনিক্যাল), ল্যামেয়ার ইন্টারন্যাশনাল পল্লি পাওয়ার সার্ভিসেস লি. ঢাকা।
* **চাথোয়াই মার্মা**, চেয়ারম্যান, ৩নং ফারুয়া ইউ.পি, বিলাইছড়ি, রাঙ্গামাটি।
* **অভিলাষ তঞ্চঙ্গ্যা**, চেয়ারম্যান, ১নং বিলাইছড়ি ইউ.পি, বিলাইছড়ি, রাঙ্গামাটি।
* **বিদ্যালাল তঞ্চঙ্গ্যা**, সভাপতি, ফারুয়া নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়, ফারুয়া, বিলাইছড়ি, রাঙ্গামাটি।
* **অমর কুমার তঞ্চঙ্গ্যা**, বিশিষ্ট ব্যক্তি, ফারুয়া, বিলাইছড়ি, রাঙ্গামাটি।
* **উৎপল বিকাশ তঞ্চঙ্গ্যা**, কর্মকর্তা, ইউ.এন.ডি.পি, রাঙ্গামাটি।
* **ভদন্ত প্রজ্ঞাদর্শী ভিক্ষু**, অধ্যক্ষ, এগুজ্যাছড়ি আর্য্যমৈত্রী বৌদ্ধ বিহার, ফারুয়া, বিলাইছড়ি, রাঙ্গামাটি।
* **স্নেহ কুমার তঞ্চঙ্গ্যা**, ইউ.পি সদস্য, ওড়াছড়ি, ফারুয়া, বিলাইছড়ি, রাঙ্গামাটি।
* **যুদ্ধমণি তঞ্চঙ্গ্যা**, ব্যবসায়ী, আলীকদম, বান্দরবান।
* **মন্দাদেবী তঞ্চঙ্গ্যা**, চাকরিজীবী, ইউনাইটেড হসপিটল, ঢাকা।
* **কাজল তঞ্চঙ্গ্যা**, চাকরিজীবী, বাংলাদেশ পুলিশ, ঢাকা।
* **উষা তঞ্চঙ্গ্যা**, চাকরিজীবী, বাংলাদেশ মেডিকেল কলেজ, ঢাকা
* **কিরণ তঞ্চঙ্গ্যা**, চাকরিজীবী, রোয়াংছড়ি, বান্দরবান।
* **শম্ভু কুমার তঞ্চঙ্গ্যা**, চেয়ারম্যান, ৪নং নোয়াপতং ইউ.পি, রোয়াংছড়ি, বান্দরবান।
* **মংগল কুমার তঞ্চঙ্গ্যা**, সমাজসেবক, আন্তাপাড়া, রোয়াছড়ি, বান্দরবান।
* **মনোরঞ্জন তঞ্চঙ্গ্যা**, শিক্ষক, বান্দরবান সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়, বান্দরবান।
* **প্রগতি খীসা**, চাকরিজীবী, জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, রাঙ্গামাটি।
* **নির্মল চন্দ্র তঞ্চঙ্গ্যা**, উপ ব্যবস্থাপক, বাংলাদেশ ব্যাংক, ঢাকা।
* **নির্মল কান্তি তঞ্চঙ্গ্যা**, বিশিষ্ট ব্যক্তি, বালাঘাটা বান্দরবান।
* **সুবল তঞ্চঙ্গ্যা**, প্রবাসী, দ:কোরিয়া।

সূ চি প ত্র

প্রবন্ধ

আজাদ বুলবুল ঃ শরণার্থীর রেশনকার্ড ও শাসকের বিবেচনা ৭

অক্ষয় মনি তঞ্চঙ্গ্যা ঃ তঞ্চঙ্গ্যা রমণীদের পাঁচ পোশাকের ঐতিহাসিক গুরুত্ব ও তার নৃতাত্ত্বিক দিক ১০

শ্রী বীর কুমার তঞ্চঙ্গ্যা ঃ পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসীদের সমস্যা, সংকট ও সম্ভাবনা ১৪

ড. মুস্তাফা মজিদ ঃ মারমা জাতিসত্তা ঃ নৃতাত্ত্বিক প্রেক্ষিত ২০

অচ্যু কুমার তঞ্চঙ্গ্যা ঃ পার্বত্য চট্টগ্রামে 'বিজু' নামে উৎসব পালনের নির্দেশনা! ৩৬

লুক্সি পুরি তঞ্চঙ্গ্যা ঃ স্মরণীয় ঘটনা : বিদ্যালয়ের শিক্ষা সফর, আনন্দের মধ্যে দুঃখের ছোঁয়া ৩৮

সিদ্ধার্থ তঞ্চঙ্গ্যা (দত্ত) ঃ রাইংখ্যং নদীর তীর ঘেঁষে ফারুয়া আদিবাসীদের জীবন চিত্র ৪১

অনুরাগ চাকমা ঃ আর কতদূর সে সময়? ৪৪

কবিতা

প্রিয়দর্শী খীসা ঃ আদিবাসী ৪৮

চন্দ্রসেন তন্চংগ্যা ঃ আমন চশা ৫০

পুচনু মার্মা ঃ আমাকে খুঁজো না তুমি ৫১

মং এ.নু ঃ পার্বত্য মাতৃভূমি ৫২

কসমিন চাকমা ঃ আদিবাসী ৫৩

উড়াল চাকমা (হিমু) ঃ যাবো না ৫৪

শরণার্থীর রেশনকার্ড ও শাসকের বিবেচনা

আজাদ বুলবুল

আমাদের বর্তমান স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা তখন লেফটেন্যান্ট কর্নেল হিসেবে পানছড়ি জোনের জোন কমান্ডার। সময়টি আজ থেকে দেড় দশক আগের-১৯৯২ সালের শেষ ভাগ। পার্বত্য চট্টগ্রামের উত্তরাঞ্চলীয় এই সীমান্ত উপজেলাটি তখন সেনাবাহিনী, শান্তিবাহিনী উভয়ের কাছে নানা কারণে গুরুত্বপূর্ণ। পানছড়ি সীমান্তের পরেই ত্রিপুরা রাজ্য। তাকুম বাড়ি, করবুক অমরপুর এসব প্রায় ঊষর পার্বত্যভূমিতে ত্রিপুরা রাজ্য সরকার শরণার্থী ক্যাম্প বানিয়ে বাংলাদেশের চাকমা উদ্বাস্তুদের মাথা গোঁজার ও কোনো মতে বেঁচে থাকার ব্যবস্থা করে দিয়েছে। বিরাজমান পরিস্থিতি বিশেষ করে ১৯৮৬ সালের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার ভয়াবহ স্মৃতিকে বুকে চেপে বসতবাড়ি, জোতজমি, শৈশব যৌবনের স্মৃতিমাখা জনপদ ফেলে তারা শরণার্থী হয়েছে। শনের ছাউনি বাঁশের খুঁটি আর বেতের দড়িতে বাঁধা অপরিসর কাঁচা বাড়িতে রেশন নির্ভর গাদাগাদি বসবাসকে কেউ কেউ নিয়তি হিসেবে মেনে নিতে পারে নি। ফলে ক্যাম্প থেকে লুকিয়ে অনেকেই ফিরে আসছে আপন ঠিকানায়। নিজের ভিটেমাটির সুনসান নীরবতা, ঘরের পেছনে জঙ্গলে ঘেরা ডোবার মধ্যে শিং-টাকি-কুইচ্চ্যা-ইচা মাছের দাপাদাপি, গাছ পাকা কাঁঠালের মাটিতে পড়ে থাকার কালচে দাগ, জং ধরা তাগল, মাচাংয়ের পাশে পড়ে থাকা কোমর তাঁতের বাঁশ কাঠ, দু'রঙা পোয়াটাক সুতা– এসব উপকরণ শরণার্থীর চোখে আশা জাগায়। রাজনীতির ঘেরাটোপে আটকা পড়ার ফাঁদ থেকে বেড়িয়ে এসে অনেকেই সমৃদ্ধ নিরুপদ্রব জীবনের স্বপ্ন দেখে। সাহসে ভর করে পরিত্যক্ত জমির জঙ্গল পরিস্কার করে। ফল বাগানের ঝোপঝাড় কেটে, বাড়ির আঙ্গিনার খালি জায়গাটা কুপিয়ে শস্যবীজ বুনে, পুরাতন মাচাং ঘরটির ইজোর মেরামত করে, পানি রাখার মাটির পাত্রটি ভালোমত পরিস্কার করে, জুমিয়া স্বচ্ছলতা ফিরিয়ে আনতে যেয়ে ভয়ার্ত শরণার্থী পরিবারটি কিছুটা সাহসী হয়ে উঠে। কিন্তু তার ফিরে আসাটা সে সময় ভালো বলে বিবেচিত হতো না জনসংহতি সমিতি'র কাছে। তবু বাঁচতে গিয়ে স্বজাতি নেতাদের চোখ রাঙানি সহ্য করে অনেকেই তখন বাংলাদেশ ও ভারতে অবস্থান করার নীতি গ্রহণ করে।

শরণার্থীদের গোপনে ফিরে আসার বিষয়টি পানছড়ি সেনা কুঞ্জের জোন কমান্ডার থেকে শুরু করে সৈনিক পর্যন্ত সবাই অবহিত। শরণার্থীরা ফিরতে শুরু করায় লোগাং বাজার জমতে শুরু করেছে। পুজগাং এর জমজমাট লোকালয়টি ৮৬'র পর হঠাৎ নীরব হয়ে যায়। ভূর্জানাল বিলের তিনপাশ ঘেরা চাকমা পাড়াগুলো জনমানবহীন হয়ে পড়ে। পুজগাং হাইস্কুলের সামনের দোকানপাট, রাইসমিল, আড্ডা-আখড়াটি শূন্যে মিলিয়ে যায়। এখন

অবশ্য দু'টো দোকান নতুন উঠেছে। শ্রাবণের নিরাক পড়া দুপুরে দুই অবসন্ন সৈনিক নতুন দোকানের ছায়ায় বসে দূর নীলিমায় তাকিয়ে থাকে। মাটির গেরুয়া হলুদ কুপ্তি থেকে ঢকঢক করে শীতল পানি পান করার পরও বোধ হয় তাদের বুকের ভেতর জ্বলতে থাকা বিষণ্ন বেদনার রেশটুকু ঠাণ্ডা হয় না।

পুজগাং আর লোগাং খালের দু'পাড়ের ত্রিপুরারা চাকমাদের ফিরে আসতে দেখে আশ্বস্ত হয়। অর্ধযুগ আগে এই জনপদ থেকে চলে যাওয়া চেনা মানুষগুলো যারা ছোট পানছড়ি, তারাবুনিয়া, দুকছড়া, চেঙ্গী, দমদমা, মিজিবিল, শান্তিপুর, লতিবান, কুকিছড়ার বিভিন্ন আড্ডা আসর মাতিয়ে রাখতো আনন্দ ফূর্তিতে; চুমুলাং ভাতাদ্যা, গাংপূজা আর কিছু উৎসবে আনন্দফূর্তিতে মেতে নাচগান, খানা পিনা চালাতো– সেসব চেনা লোকগুলোকে ফিরে আসতে দেখে ত্রিপুরা, মারমা, সাঁওতাল ও বাঙালিরা ভীষণ খুশি হয়। আহ্লাদিত আবেগে হাত চেপে ধরে জানতে চায় "কেনজান আগচ তুই, গমবঅ?" শরণার্থী লোকটির সব উচ্ছলতা ততদিনে মরে গেছে। চেনা মানুষের এই হৃদয় নিংড়ানো আবেগে বিস্মিত হবার মতো ক্ষমতা এখন তার নেই।

সেদিন ছিলো মঙ্গলবার। পানছড়ির সাপ্তাহিক হাট সেদিনই বসে। দূর পাহাড় থেকে, চেঙ্গীর একবুক পানি সাঁতরে, বহুদূর জঙ্গলের পথ হেঁটে, নিজের জমিতে ফলানো শস্য, তরিতরকারি, ফলমূল, শাকপাতা, মরিচ, মসলা– আর কিছু পাওয়া না গেলে এক বোঝা বাঁশ বা দুই ভার লাকড়ি কাঁধে করে তারা বাজারে আসে। সকাল সকাল বাজার বসে। দুপুরের মধ্যেই বেচা কেনা শেষে দূর পাহাড়ের গ্রামের পথে পা বাড়ায় তারা। বাজার থেকে তারা কেনে লবণ, কেরোসিন, তামাকের জন্য রাবগুড় আর নাপ্পি। কেই কেউ শুঁটকি মাছ, বিড়ি, সস্তা সিগারেট, শুকরের মাংস– সামর্থ্য অনুযায়ী কেউ বা বিস্কুট, চানাচুর, কেক, পাউরুটি কিনে হাঁটাপথ ধরে অথবা চাঁদের গাড়িতে বাদুড় ঝোলা হয়ে গ্রামে পৌঁছে।

সেদিনের বাজারের ভিড়টা ছিলো অন্যান্য দিনের তুলনায় কয়েকগুণ বেশি। পানছড়ির চতুর্মুখী প্রশাসনের প্রধান স্তর তখন জোন কমান্ডারের নেতৃত্বাধীন আর্মি প্রশাসন। টি.এন.ও সাহাবুদ্দিনের নেতৃত্বে দ্বিতীয় স্তর উপজেলা প্রশাসন। ইউ.পি. চেয়ারম্যান, বণিক সমিতি ও রাজনৈতিক ব্যক্তিবর্গের সমন্বয়ে সিভিল সোসাইটি আর বিপ-বের রক্তাক্ত বাণী, তেজোদীপ্ত জেদ বুকে নিয়ে হাঁটা জনসংহতি সমিতি ও পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের অকুতোভয় তারুণ্য। হাটবারে হঠাৎ করে নতুন মুখের অতিরিক্ত উপস্থিতি আর্মি ও থানা প্রশাসনকে চিন্তায় ফেললেও অন্য দুটো অংশ জানে এই নতুন মানুষগুলো কারা। অনেক বাক্স-প্যাটরা, বোচকা-বুঁচকি, শিশু আর বুড়োবুড়ির সমন্বয়ে গড়ে ওঠা মানুষের দীর্ঘ মিছিলটি শরণার্থীদের। জোন কমান্ডার লেফটেন্যান্ট কর্নেল আবদুল মতিন, টি.এন.ও শাহাবুদ্দিন, সদর ইউপি চেয়ারম্যান ডাঃ হাবিব, লোগাং ইউপির চেয়ারম্যান কিরণ ভূইয়া, চেঙ্গী ইউপির চেয়ারম্যান শশীকমল চাকমা, লতিবানের চেয়ারম্যান খগেশ্বর ত্রিপুরা, জেলা পরিষদ সদস্য চাই থোয়াইঅং চৌধুরী, মোহাম্মদ শফি, মিন্টু বিকাশ চাকমা, পানছড়ি কলেজের অধ্যক্ষ সমীর দত্ত চাকমা, বাজার হাইস্কুলের হেড মাস্টার জ্ঞান প্রভাত তালুকদার, সাবেক উপজেলা চেয়ারম্যান বকুল চন্দ্র চাকমা, পুজগাং মৌজার হেডম্যান সুইলাপ্রু চৌধুরী, সাবেক চেয়ারম্যান জগদীশ চাকমা, স্যারেন্ডার্ড শান্তিবাহিনী দীপেন্দু চাকমা, শান্তি রঞ্জন কারবারী,

মধু মঙ্গল কার্বারী, সাপ্তাহিক পার্বতীর সাংবাদিক ডাঃ সৈয়দ, বণিক সমিতির আমিন শরীফ, যাত্রাদলের এক সময়কার নায়ক রাজকুমার সাহা, সমাজকর্মী ইন্দিরা রানী ত্রিপুরা, গানের মাস্টার থৈবংগ মারমা, সাধন মাস্টারসহ পানছড়ির গুরুত্বপূর্ণ প্রায় সবাই বাজারের বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে একটা কথা নিয়েই আলোচনায় মশগুল হচ্ছে – সেটা হলো পানছড়িতে আটকা পড়া ত্রিপুরা শরণার্থী ক্যাম্পের হাজার হাজার নারী পুরুষের ভাগ্যে এরপর কি জুটবে? জোন কমান্ডারের বক্তব্য একদম সোজাসাপ্টা, 'দিনের আলোয় হাজার হাজার মানুষ বাংলাদেশের সীমান্ত অতিক্রম করে বিডিআর, বিএসএফ এর সামনে তুড়ি বাজিয়ে বর্ডার ক্রস করবে তা হতে পারে না। না, পানছড়ি জোনের চেকপোস্ট হয়ে সীমান্ত অতিক্রম করার জন্য একসাথে এতো লোককে যেতে দেয়া যায় না।' বিডিআর কমান্ডার মেজর হাবিবও তা চান। জনস্রোত কিন্তু বন্ধ হয়ে নেই। দিঘিনালা, পাবলা খালি, কবাখালি, মেরুং, কাটারুং, বাঘাইছড়ি, তুলাগন সিজক দূরছড়ি মাহিল্যা, লংগদু নানিয়ার চর, মহালছড়ি, মাইসছড়ি, নুনছড়ির বিভিন্ন জনপদ থেকে গাঁটরি-বোচকা নিয়ে আসা শরণার্থীর সংখ্যা কেবল বাড়ছেই। শীত যেন এবার একটু আগেভাগেই নেমে পড়েছে। তবু পানছড়ি বাজার হাইস্কুল মাঠ, আদালত প্রাঙ্গন, থানা চত্বর হয়ে শরণার্থীদের ভিড় টিলার মুখ পর্যন্ত বিস্তৃত হলো। উদ্বেগ উৎকণ্ঠা আর হঠাৎ নেমে আসা ঠাণ্ডাকে কমাতে অনেকেই কষে টান দিচ্ছে বিড়িতে। কেউ কেউ ব্যাগ পুটলির পাশে হেলান দিয়ে চা দোকান থেকে জ্বলন্ত কয়লা চেয়ে এনে ধরিয়ে ফেলছে ডাবা।

রাত বাড়ছে। হুস হাস করে ধেয়ে যাচ্ছে সামরিক কনভয়। ওয়ারলেসে কথা হচ্ছে উচ্চ স্বরে। সঙ্গীন উঁচিয়ে খোলা জিপে টহল দিচ্ছে ম্যালিট্যান্ট সৈনিক। দূরে হঠাৎ ঝুম্ শব্দে রাতের নির্জনতা ভাঙে। তার জবাবে আরো দূর থেকে শোনা যায় মেশিনগানের হুংকার। পানছড়ি থানার চত্বরে গুটিশুটি মেরে পড়ে থাকা নির্ঘুম মা গোলাগুলির শব্দে ভীত হয়ে তার দু'শিশুকে বুকে চেপে ধরে। গাছের পাতায় জমে থাকা কুয়াশার কয়েকটি ফোটা পড়ে রাতজাগা মেয়েটির মাথায়, কপালে। সেই ফোটা ফোটা কুয়াশা অশ্রু হয়ে একসময় ঝরে পড়ে তার দুঃখিনী জন্মভূমির মাটিতে।

পুনশ্চ ঃ দৈনিক চিনিকক, আগরতলা, ত্রিপুরা (২৮ নভেম্বর, ১৯৯২)

'ত্রিপুরা রাজ্য সরকার আগামী শনিবার বাংলাদেশী শরণার্থী ক্যাম্পের রেশনকার্ড নবায়ন করিবে। কার্ড নবায়নের সময় যাহাদেরকে উপস্থিত পাওয়া যাইবে না তাহাদের উপস্থিত কার্ড বাতিল করা হইবে এবং বাতিলকৃত ব্যক্তিকে কোনোরূপ রেশন বরাদ্দ করা হইবে না। আমাদের দক্ষিণ অমরপুর প্রতিনিধি জানান শরণার্থী ক্যাম্পগুলোর নেতৃবৃন্দ এতোদিন চাকমাদের বাংলাদেশে যেতে বাধা না দিলেও সাম্প্রতিক সময়ে কাউকেই সীমান্ত অতিক্রম করিতে দেওয়া হইতেছে না। পাশাপাশি ইতোপূর্বে যাহারা শরণার্থী ক্যাম্প ছাড়িয়া বাংলাদেশে ফিরিয়া গিয়াছে তাহাদেরকে ফিরাইয়া আনিবার জোর চেষ্টা চলিতেছে বলিয়া শরণার্থী নেতাদের একটি সূত্র দাবি করিয়াছে।'

লেখক : অধ্যাপক ও গবেষক, বাংলা বিভাগ, হাজী মুহাম্মদ মহসিন কলেজ, চট্টগ্রাম।

প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ মাটিছড়িবন (১৯৯৯), পার্বত্য চট্টগ্রামের ত্রিপুরা ভাষা পরিচিতি (২০০০), পার্বত্য চট্টগ্রামের মানস সম্পদ (২০০৪), পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতীয় সংস্কৃতি (২০০৫), স্বপ্নভ্রষ্টা কাপ্তাই বাঁধ (২০০৮)।

তঞ্চঙ্গ্যা রমণীদের পাঁচ পোশাকের ঐতিহাসিক গুরুত্ব ও তার নৃতাত্ত্বিক দিক

অক্ষয় মণি তঞ্চঙ্গ্যা

ভারত উপমহাদেশের দক্ষিণ-পূর্বাংশে যত মঙ্গোলীয় জনগোষ্ঠীর লোক আছে তাদের মধ্যে চেহারাগত বৈসাদৃশ্য বা পার্থক্য খোঁজা দুরূহ কাজ। সকলকেই দেখতে কম বেশি এক ও অভিন্ন মনে হয়। ভুটানী, থাই, বার্মিজ, কম্পোডিয়ান, ভিয়েতনামী, চাকমা, মারমা, ত্রিপুরা, তঞ্চঙ্গ্যাসহ অন্যান্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আদিবাসী জনগোষ্ঠীর লোকদের চেহারাগত তফাৎ খোঁজা খুবই কঠিন কাজ। এতো গেল এ অঞ্চলে বসবাসরত মঙ্গোলীয় জনগোষ্ঠীর চেহারাগত মিল-অমিলের দিক।

বাংলাদেশের বৃহত্তর পার্বত্য চট্টগ্রামে বসবাসরত চৌদ্দটি বড় কিংবা ছোট দলভুক্ত আদিবাসীদের মধ্যে কমবেশি প্রত্যেকটি জাতিসত্তার নিজস্ব ভাষা, আচার-অনুষ্ঠান, রীতি-নীতি, ধরন-ধারণ, তথা কৃষ্টি ও সংস্কৃতির ধারা স্ব-স্ব রীতিতে প্রবাহমান। তন্মধ্যে কিছু সংখ্যক জাতিদের মধ্যে বাংলাভাষা ও মাতৃভাষার সাহিত্য চর্চার রীতি প্রাচীন ও অপেক্ষাকৃত উন্নত। কিছু কিছু জাতির জীবনাচার অন্ধকারাচ্ছন্ন ও অজ্ঞতাপূর্ণ ছিল বিধায় হয়তো পুরনো রীতিনীতিতে থাকলেও তা ধরে রাখতে পারেনি। তারা প্রত্যেকে কিছু না কিছু নিজেদের জাতিসত্তার ইতিহাস ও ঐতিহ্য আর সংস্কৃতি মৌখিক কিংবা লিখিত দলিলের মাধ্যমে বংশ পরম্পরায় জিইয়ে রেখে চলেছে। কেউ কেউ হারিয়েও ফেলেছে। এ অঞ্চলে বসবাসরত আদিবাসীদের নিয়ে সেই পর্তুগীজ, বৃটিশ আমলে এবং পরবর্তীতে পাকিস্তান আমলে গুটিকয়েক লেখক ; যেমন– হেমিলটন, ড. ফ্রান্সিস, বুকানন, ফেরী, হ্যার্শ্চিনশন, ওয়াজিবুল অর্জিজ, ডেবোরোস, সতীশ ঘোষ, লিউইন, আবদুল হক প্রমুখ লিখে গেছেন। কেউ শখের বশবর্তী হয়ে, কেউ রাজনৈতিক কারণে নিজ নিজ ইতিহাসের ধারাকে স্রোতধারারূপে বজায় রেখে মূল বাস্তবতাকে এড়িয়ে ইতিহাস রচনায় ব্রতী হয়েছিলেন। এতে অনেক ক্ষেত্রে প্রকৃত বাস্তবতা ধামাচাপা থেকেই গেছে।

বেশি দিনের কথা নয়– বিগত ৬০/৭০ বছরেরও আগে এখানকার মানুষের জীবনধারা, পোশাক-পরিচ্ছদ, খাওয়াদাওয়া, আচার-আচরণ বর্তমানের চেয়ে বহুলাংশেই অজ্ঞতায় পরিপূর্ণ ছিল। অশিক্ষা-কুশিক্ষায় সমাজ জীবন ছিল অন্ধকারাচ্ছন্ন যুগের মতই। ১০০ থেকে ১৫০ বছরের আগের অবস্থা হয়তো আরও অজ্ঞতা ও অঘোর ঘোরাচ্ছন্ন ছিল। বিভিন্ন লেখকের লেখনীতে ও প্রবীণ ব্যক্তিবর্গের ভাষ্যমতে জানা যায় যে, বর্তমান তঞ্চঙ্গ্যা

জনগোষ্ঠীরাই 'মূল চাকমা' জাতি ছিল– এ কথা প্রবীণ চাকমা সমাজে বহুল প্রচলিত ও স্বীকৃত এবং বর্তমানেও চাকমাদের মাঝে এ ধারণাটা বদ্ধমূল আছে। চাকমা জাতি সম্পর্কে বিভিন্ন লেখক বিভিন্ন ইতিহাস রচনা করেছেন।

বর্তমান চাকমা ও তঞ্চঙ্গ্যারা একই জাতিসত্তার উত্তরসুরি বলা হলেও আদৌ সত্য কিনা তার প্রকৃত তথ্য ও সাক্ষ্য প্রমাণ সঠিকভাবে কোথাও পাওয়া যায়নি। পর্তুগীজ, মোগল ও ইংরেজ আমলের বিভিন্ন অফিস আদালতের তথ্যাদি ও সমসাময়িক ইতিহাসবিদগণের বর্ণনায় বিভিন্ন ধরনের তথ্য পাওয়া যায়– এতে কেউ কেউ তঞ্চঙ্গ্যা ও চাকমা জাতির ভিন্নতার পক্ষে মত দিয়েছেন। কেউ কেউ এক ও অভিন্ন বলে যুক্তি দেখিয়েছেন। চাকমা ও তঞ্চঙ্গ্যাদের মধ্যে কৃষ্টি ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে কিছু মিল আছে বলেই অনুমান নির্ভর বলা হয়ে থাকে যে তঞ্চঙ্গ্যা ও চাকমারা একই জাতিভুক্ত। যেমন বিরাজ মোহন দেওয়ান কর্তৃক রচিত 'চাকমা জাতির ইতিবৃত্ত' বইটিতে বলা হয়েছে– তঞ্চঙ্গ্যা ও চাকমাদের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। কেবল কালক্রমে পৃথক অবস্থানেরই ফলে ভাষা, আচরণ, কথনভঙ্গিতে পরিবর্তন এসেছে। যেহেতু লোকসাহিত্য বা লোকগীতি তথা 'গীংগুলি', গীতের সুর, ব্যক্তি, উপাত্ত-উপাখ্যান, উপকরণাদি (যেমন চান্দবী বারমাস, চাদিগাংছাড়া পালা, রাধামন-ধনপুদি পালা, গীলা পারা পালা, মিঙাবি বারমাস ইত্যাদি), উভাগীত প্রভৃতি উভয় সংস্কৃতিতে প্রবাহমান হয়ে এসেছে।

অপরদিকে, তঞ্চঙ্গ্যা জাতি পরিচিতিতে তঞ্চঙ্গ্যা সমাজের প্রখ্যাত লেখক বাবু বীর কুমার তঞ্চঙ্গ্যা 'তঞ্চঙ্গ্যা'দের একটি আলাদা জাতি হিসেবে বিভিন্ন প্রমাণাদি উপস্থাপন করেছেন। তাঁর দৃষ্টিতে যেহেতু চাকমাদের ৪৬টি গোজা গোষ্ঠীর মধ্যে তঞ্চঙ্গ্যাদের ১২টি গোজার একটিরও অন্তর্ভুক্তি নেই; সেই দৃষ্টিতে তাঁর (বিরাজ মোহন দেওয়ান) যুক্তি অকাট্য। তঞ্চঙ্গ্যাদের ১২টি গোজার একটির শব্দ প্রয়োগ আছে বলে বিভিন্ন লেখকের বিচার-বিশ্লেষণের মাধ্যমে জেনেছেন। বাংলাভাষার শব্দ তঞ্চঙ্গ্যাদের মধ্যে বহুল প্রচলিত হওয়ার কারণের যুক্তির স্বপক্ষে যুক্তি এই– পর্তুগীজ আমল, মোগল আমল ও বৃটিশ আমল পর্যন্ত ভারতবর্ষের মঙ্গোলীয় ও অমঙ্গোলীয় সীমান্তবর্তী এলাকাগুলোর (বর্তমান চট্টগ্রাম ও পার্বত্য চট্টগ্রামের সীমারেখা) প্রায় ৫০০ থেকে ৬০০ বছর ধরে সংশ্রব বা সহঅবস্থানের ফলে সংস্কৃতি কিছু কিছু ঢুকে পড়াটা বিচিত্র কিছু নয়। বিশদভাবে বলতে গেলে বর্তমান পার্বত্য চট্টগ্রাম ও চট্টগ্রামের মানচিত্রের দিকে একটু দৃষ্টি দিলে,তা পরিষ্কার বোঝা যাবে। দক্ষিণে কক্সবাজার জেলার জেলা সদর, টেকনাফ, উখিয়া (তবে তারা নিজেদের তঞ্চঙ্গ্যা হিসেবে দাবী করলেও পদবী– চাকমা ব্যবহার করে) ও বান্দরবান জেলার জেলাসদর, রুমা, লামা, নাইক্ষ্যংছড়ি, থানচি, আলীকদম, রোয়াংছড়ি উপজেলা সমূহে এবং রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলার রাজস্থলী, বিলাইছড়ি, কাপ্তাই, রাঙ্গামাটি সদর ও কাউখালী উপজেলাসমূহের বিভিন্ন মৌজাগুলোতে এবং তৎসংলগ্ন চট্টগ্রাম জেলায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে তঞ্চঙ্গ্যাদের বসবাস। পক্ষান্তরে, অপেক্ষাকৃত পূর্বে যেমন ঃ লঙগদু, বাঘাইছড়ি, বরকল, জুরাছড়ি, নানিয়ারচর ও খাগড়াছড়ির সকল উপজেলাগুলোতে তঞ্চঙ্গ্যা জনগোষ্ঠীর লোক নেই বললেই চলে। এতে প্রতীয়মান হয় যে যুগ যুগ ধরে বাঙালীদের (হিন্দু ও মুসলিম) সংশ্রবে থেকেই বাংলা শব্দ তঞ্চঙ্গ্যাদের ভাষার মধ্যে ঢুকে পড়েছে।

প্রত্যেক জাতি বা নৃতাত্ত্বিক গোষ্ঠীর নিজ নিজ রমণীদের স্বকীয় পোশাক দেখলেও ঐ জাতি সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা পাওয়া যায়। যেমন ঃ শাড়ি পরা রমণী দেখলে বোঝা যায় বাঙালী, স্কার্ট পরা রমণী কোনো পশ্চিমা, থামি পরা দেখলে কোনো বার্মিজ রমণী বা থাইল্যান্ডী ইত্যাদি। পার্বত্যাঞ্চলে এগারটি আদিবাসীর মধ্যে তঞ্চঙ্গ্যারা আনুমানিক ৬০ কি ৭০ হাজারের কম নয়।(অবশ্য সরকারি তথ্যমতে এতো নয়)। তার প্রধান কারণ চট্টগ্রামের দক্ষিণাঞ্চলে যেমন উখিয়া, কক্সবাজার, টেকনাফ, রুমা, লামা, নাইক্ষ্যংছড়ি, আলীকদম উপজেলার আদিবাসীরা তঞ্চঙ্গ্যা হলেও পদবী চাকমা ব্যবহার করে যা পূর্বেই বলা হয়েছে। শিক্ষা-দীক্ষায় অনগ্রসরতা ও উত্তরাঞ্চলের বর্তমান শিক্ষিত তঞ্চঙ্গ্যা জনগোষ্ঠীর সাথে বিচ্ছিন্নতার কারণেই নিজেরা এখনও চাকমা বলেই পরিচয় দেয়। হয়তো চিরাচরিত জনশ্রুতি বজায় রেখে চাকমা বলে পরিচয় দেয়। এ বিষয়ে বিশদভাবে বর্ণনা দিতে গেলে অতীতের দিকে এগুতে হয়– চাকমাজাতির ইতিহাস লেখকগণের মতে জানা যায়, কালাবাঘার রাজা বিজয়গীরি দেশ জয়ের উদ্দেশ্যে উত্তর থেকে দক্ষিণ দিকে তাঁর দুই সেনাপতি রাধামন ও কুঞ্জধনকে নিয়ে চাদিগাং (বর্তমান চট্টগ্রাম বিভাগের দক্ষিণাংশ) জয়ের পর রোয়াং (বর্তমান লোহাগড়া, টেকনাফ, উখিয়া ও কক্সবাজার অঞ্চল) বিজয় করে পরবর্তীতে আরাকান দখল করেন। সেখানে মগদের পরাজিত করে বংশানুক্রমে রাজত্ব করতে থাকে চাকমা রাজবংশ। ১৩৩৩ খ্রিস্টাব্দে রাজা অরুনযুগের রাজত্বকালে পর্তুগীজদের সহায়তায় মগরাজা মিনদি বিদ্রোহ করে চাকমা রাজাকে পরাজিত করে তিন রাজপুত্র ও দুই রাজকন্যাকে বন্দি করেন। পরবর্তীতে জ্যেষ্ঠ রাজপুত্র সূর্যজিতকে কৎকডোজা প্রদেশের শাসক (আরাকানী নাম সাজুই), দ্বিতীয় রাজপুত্র চন্দ্রজিত (আরাকানী নাম চাম্প্রো) কে 'মিজা' বা মিংডোজায় এবং তৃতীয় রাজপুত্র শত্রুজিতকে (আরাকানী নাম চৌতা) কাংজা নামক স্থানের রেভিনিউ কালেক্টর হিসেবে নিয়োজিত করেন। এ যুদ্ধে ১০,০০০ সৈন্য বন্দি হয়। যুদ্ধে পরাজিত সৈনিকগণ (তথা চাকমা সমাজের সকল শক্তসমর্থ পুরুষ) পলায়ন করে গভীর অরণ্যে অবস্থান নিয়েছিল। পরবর্তীতে উত্তরদিকে তারা সরে আসতে থাকে। যুদ্ধ-বিগ্রহের পর সকল নিরীহ বৃদ্ধ-বৃদ্ধা, নারী-শিশুদেরকে আরাকানের উত্তর অংশের পাহাড়িয়া এলাকায় বসবাসের জন্য অনুমতি দেওয়া হয়।

মগেরা পাহাড়কে 'টং' বলে। পাহাড়ে বসবাসের অনুমতি প্রাপ্ত চাকমাজাতির ঐ অংশকে তৈনটংগ্যা বা দৈনাক বলা হয়। এখনও চাকমা সমাজের প্রবীণ ব্যক্তিরা এক বাক্যে স্বীকার করেন যে তঞ্চঙ্গ্যারাই মূল বা আসল চাকমা এবং বর্তমান চাকমাদের ইতোপূর্বে বলা হতো– 'আনক্যা' চাকমা। এর প্রধান কারণ হচ্ছে- মূল চাকমা রমণীদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে তারা যে বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর রমণীর পানি গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছেন, ফলে তাদের মধ্যে কিছুটা স্বকীয়তা হারিয়ে গিয়ে কেহ কেহ মাস মোঙালী, চেহারায় বিবর্তন এসে অপেক্ষাকৃত সুঠামদেহী ও সুন্দর মুখাবয়বধারী হয়। একটু লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে প্রকৃত মোঙ্গলীয়রা তত সুন্দর চেহারাধারী হয়না। এদিকে মূল চাকমা রমণীরা তাদের স্বভাবজাত আচরণ ও হাতে বোনা কাপড় পরনে অভ্যস্ত বিধায় পোশাকের কোনো পরিবর্তন না করে স্বতন্ত্রতা বজায় রেখে যুগের পর যুগ ব্যবহার করে এসেছে এবং আজও ঐ ঐতিহ্য বজায় রেখেছে বলেই গর্ব করে কথা প্রসঙ্গে বলে 'পাঁচ পোশাকধারী তঞ্চঙ্গ্যা'।

পরবর্তীতে মগদের অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে উত্তর দিকে নিজের দলভুক্ত চাকমাদের সাহচর্যের আশায় অধিকাংশ তঞ্চঙ্গ্যা আরাকান ত্যাগ করে উত্তরদিকে সরে এসে টেকনাফ, উখিয়া, নাইক্ষ্যংছড়ি, আলীকদম, রুমা, লামা, বান্দরবান জেলার বিভিন্ন এলাকায় বসতি শুরু করে। ১৯৬০ সনের আগ পর্যন্ত সর্বশেষ উত্তরের মৌজা মানিকছড়ি, বড়াদম, ওয়াগ্গা, ঘাগড়া মৌজার সীমা পর্যন্ত তঞ্চঙ্গ্যাদের বসতি ছড়িয়ে পড়েছিল। সার্বিক বিচার বিশ্লেষণে স্পষ্ট ধারণা জন্মে যে তঞ্চঙ্গ্যারাই মূল চাকমাজাতির পোশাক-পরিচ্ছদ এর সংস্কৃতির মূল ধারক ও বাহক। তঞ্চঙ্গ্যা রমণীরাই চাকমা জাতির রাজপরিবারের ঐতিহ্য ধারণ করে রয়েছে। চাকমা ও তঞ্চঙ্গ্যারা সমাজে কথা প্রসঙ্গে বলে থাকে পাঁচ পোশাকধারী তঞ্চঙ্গ্যা বা মূল চাকমা। এর অর্থ স্বকীয়তারক্ষাকারী জাতি। তাদের পাঁচ পোশাক যথাক্রমে ১) শালুম (চাকমা-সিলুম, বাংলা জামা), ২) খাদি (চাকমা- খাদী, বাংলা- বক্ষ বন্ধনী), ৩) পিনৈন (চাকমা-পীনোন, বাংলা- পরনের কাপড়), ৪) ফাউদুরী (চাকমা ফারদুরী, বাংলা কোমর বন্ধ নদী), ৫) মাধা কবং (চাকমা-খবং, বাংলা-পাগড়ী)। পার্বত্যঞ্চলে যত জনগোষ্ঠী আছে ৫০/৬০ দশকের পূর্বে (বর্তমানে পার্বত্য সভ্যতার পূর্বে) কোনো জনগোষ্ঠীর পোশাক-আশাকে এত দৃষ্টিনন্দন ও অপূর্ব কারুকার্যখচিত বাহারী পোশাক ও বুননশৈলীর রেওয়াজ দেখা যেত না। তৎকালীন সময়ে অপরাপর জনগোষ্ঠীর পোশাকের সাথে তুলনা করলে আপাদমস্তক আচ্ছাদিত সম্ভ্রমশীল পোশাক দ্বিতীয়টি ছিলনা, বর্তমানেও তার বিপরীত নয়। প্রত্যেকটি পোশাক বিচার বিশ্লেষণ করলে তবেই বুঝা যাবে এর অতুলনীয় শৈল্পিক কাজ। অবশ্য বর্তমানে আদিবাসীদের মধ্যে সভ্যতার বিবর্তনের সাথে সাথে আধুনিকতার চিন্তাচেতনায় সুন্দর সুন্দর পোশাক বুননে কমবেশি সকলেই সচেষ্ট। কিন্তু তঞ্চঙ্গ্যা রমণীদের পাঁচ পোশাকের গুণগতমান ও ঐতিহ্যের বিচারের কথা বলা হচ্ছে আজ থেকে ১০০/১৫০ বছরের সময়কালের পোশাকের অথচ সে সময়কালে পোশাকের ক্ষেত্রে অধিকাংশ জনগোষ্ঠীর নারীরা বুননে অনুন্নত ছিল। এ পাঁচ পোশাক বিচার-বিশ্লেষণ করলে সুস্পষ্ট প্রতিভাত হয় যে এই পোশাকগুলোই চাকমা রাজ পরিবারের ঐতিহ্যবাহী রাজকীয় পোশাক। যা অতীতের কোনো যাত্রা-থিয়েটারে রাজা-বাদশাদের মাথায় পাগড়ী পরিধানের রেওয়াজ লক্ষ্য করা যায়। এ পাগড়ি সম্মানের ও অভিজাত্যেরই প্রতীক। যুক্তি খণ্ডনের সপক্ষে হয়তো কেউ কেউ বলতে পারেন যে কোন কোন উপজাতির পুরুষ বা মহিলারা ও পাগড়ি ব্যবহার করে থাকেন। এ কথাটা স্বতঃসিদ্ধভাবে বলা যায় যে তঞ্চঙ্গ্যা রমণীদের উল্লেখিত পাঁচ পোশাকের মত কোন ক্রমেই সুনির্দিষ্ট, সুচারু ও সুনিপুণ এবং সমমাপের ও একই ডিজাইনের অন্যান্য জনগোষ্ঠীর রমণীদের মধ্যে ছিল না।

নৃতাত্ত্বিক, সাংস্কৃতিক, কৃষ্টি, ভাষা ও বর্ণমালা তথা সামগ্রিক বিচারে হাজার বছরের ঐতিহাসিক বিবর্তন সুদীর্ঘ সময়ের মধ্যে দিয়ে আজ এই জাতি অনেক দূর এগিয়েছে এবং সৃজনশীল নানা কর্মের মধ্য দিয়ে আরো এগিয়ে যাবে সেই স্বপ্নটুকু আমরা সবাই বারে বারে দেখি।

পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসীদের সমস্যা, সংকট ও সম্ভাবনা

শ্রী বীর কুমার তঞ্চঙ্গ্যা

জাতিসংঘের পরিসংখ্যান মতে সমগ্র বিশ্বে এ যাবত ৩০ কোটি আদিবাসী লোকের সংখ্যা জানা গিয়েছে। ৫০০০ পৃথক পৃথক জনজাতির এইসব আদিবাসী জনগণ বিশ্বের ৭০টি দেশে প্রান্তীয় জনগোষ্ঠী হিসেবে বসবাস করছেন। ইতোমধ্যে সংখ্যায় নগণ্য অনেক জনজাতির লোকই পৃথিবীর বুক থেকে চিরতরে বিলীন হয়ে গেছে। বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরাম এর পরিসংখ্যান মতে বাংলাদেশে এই রকম ৪৫টি পৃথক পৃথক জনজাতির ন্যূনপক্ষে ছাব্বিশ লক্ষ আদিবাসী লোক আছেন। তন্মধ্যে তেরটি পৃথক জনগোষ্ঠী সমন্বয়ে প্রায় ৮ লক্ষ আদিবাসী লোকের বাসভূমি পার্বত্য চট্টগ্রাম।

আদিবাসী মানুষের প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ, নিপীড়ন-নির্যাতনের ইতিহাস দীর্ঘদিনের। প্রায় পাঁচশত বছরেরও অধিক আগে ইউরোপীয় বণিকেরা যখন বাণিজ্য ব্যপদেশে বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে পড়ে এবং বিভিন্ন দেশে উপনিবেশ গড়ে তোলে, বিশেষত কলম্বাস আমেরিকা আবিষ্কার করলে সেখানে যখন উপনিবেশ গড়ে তোলা হয়, তখন এবং উপনিবেশ স্থাপনকারী গোষ্ঠী স্থানীয় আদিবাসীদের ভূমি দখল করে নেয় এবং তাদের উপর অত্যাচার শুরু করতে থাকে। এই স্থানীয় অধিবাসীরাই আদিবাসী বলে অভিহিত, স্থানীয়ভাবে বংশ পরম্পরায় জন্মগ্রহণকারী বা বসবাসকারী যাদের ইংরেজিতে Indigenous peoples আখ্যা দেওয়া হয়। এই আদিবাসীদের হয় বিতাড়ন, নতুবা অভিবাসন কারীদের সঙ্গে অঙ্গীভূত (Assimilation) করা শুরু হয়। এই ব্যাপারে খৃস্টান মিশনারীদের ভূমিকা ছিল জোরদার। মিশনারীরা জোর করে আদিবাসী শিশুদের মিশনারী স্কুলগুলোতে রাখত এবং খৃস্টান ধর্মে দীক্ষা দিত।

আদিবাসী জনগণ স্বভাবতই শান্ত ও নিরীহ প্রকৃতির হয়ে থাকে। কিন্তু তারা এত শান্ত, নিরীহ কেন হয় এবং কেনই বা নিপীড়িত, নির্যাতিত, বিতাড়িত ও Assimilation এর শিকার হয়? এর কারণ অভিবাসনকারীরা নতুন জায়গায় অভিবাসনের লোভে খুবই দুর্দান্ত ও ধৈর্য্যহীন হয়, আদিবাসীদের শান্ত সুন্দর জীবনের প্রতি লোভী হয়, নিজেদের অস্থির জীবনের বিনিময়ে আদিবাসীদের সুন্দর, শান্ত জীবনকে কেড়ে নিতে চায়। প্রথম থেকে তারা নির্ঝঞ্ঝাট জীবনের অধিকারী বলে শান্ত, নিরীহ হয়ে থাকে।

যতদূর জানা যায় ১৯৬০ দশকের শেষান্তে এবং সত্তর দশকের শুরুতে রাষ্ট্র কর্তৃক আদিবাসী মানুষের মৌলিক অধিকার হরণের বিরুদ্ধে, বৈষম্যমূলক আচরণ এবং ক্ষমতাসীন জনগোষ্ঠীর সঙ্গে অঙ্গীভূত (Assimilation) করার বিরুদ্ধে আদিবাসীদের আন্দোলন শুরু

হয়। এই সময় স্থানীয়, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে আদিবাসীদের সংগঠন গড়ে ওঠে এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ে লবিং শুরু হয়। তবে আদিবাসীদের এই আন্দোলনের জনক হলেন কানাডার আদিবাসী নেতা, Council of the Iroquoi এর মুখপাত্র Confederation Cayuga Chief Deskaheh, যিনি প্রথম আন্তর্জাতিক সংগঠনের মিটিংয়ে যোগ দেন। তিনি ১৯২৩ সালে জেনেভায় লীগ অব নেশন্স এর মিটিংয়ে কানাডার আদিবাসী এবং কানাডীয় সরকারের মধ্যকার বিরাজিত দীর্ঘদিনের কলহ সম্পর্কে উত্থাপন করেন।

ইতোমধ্যে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বহু পরিবর্তন ঘটে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর League of Nations এর স্থলে United Nations organisation বা জাতিসংঘ গঠিত হয়। আদিবাসীদের অধিকার আদায়ের লবি আন্তর্জাতিক কমুনিটি এবং বিশেষভাবে জাতি সংঘের Human Rights Bodies (মানবাধিকার কমিশন) এর মনোযোগ আকর্ষণ করে। আন্তর্জাতিক কম্যুনিটির দীর্ঘ সময়ের বিভিন্ন উদ্যোগের ফলে জাতিসংঘের সাব কমিশন অন হিউম্যান রাইট্স কর্তৃক প্রদত্ত সুপারিশ ক্রমে ১৯৮২ সালে Working Groups on Indigenous Populations (WGIP) সৃষ্টি করা হয়। ১৯৮২ সাল থেকে চলে আসা WGIP এর সাফল্য হচ্ছে তাদের প্রণীত আদিবাসী অধিকার বিষয়ক ঘোষণাপত্র (খসড়া) Draft United Nations Declaration on the Rights of Indigenous People ১৯৯৩ সালে জাতিসংঘ কর্তৃক গৃহীত হয় এবং ১৯৯৩ সালে জাতিসংঘ কর্তৃক আন্তর্জাতিক আদিবাসী দিবস ঘোষণা করা হয়। ফলে আদিবাসীদের ভাগ্যের পরিবর্তন হয়ে তাদের জীবনে নতুন অমিত সম্ভাবনার দুয়ার খুলে যায়।

আদিবাসীদের সমস্যা ঃ

এই নিবন্ধের প্রথমে উল্লেখ করা হয়েছে যে, বিশ্বে যখন উপনিবেশ স্থাপন শুরু হয়– তখন থেকেই উপনিবেশ স্থাপনকারী বা অভিবাসনকারী এবং স্থানীয় আদিবাসীদের মধ্যে সংঘাতের সূত্রপাত হয়। উপনিবেশ স্থাপনকারীগণ আদিবাসী জনগণকে নিম্নলিখিতভাবে নিপীড়ন করে ঃ

ক) আদিবাসীদের বসতি ও ভূমি থেকে উচ্ছেদ, বিতাড়ন ;

খ) ভূমি, ভূখণ্ড ও অন্যান্য প্রাকৃতিক সম্পদের ব্যবহার থেকে বঞ্চিত করণ ;

গ) বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর সঙ্গে আদিবাসীদের Assimilation অর্থাৎ আদিবাসী জনগণকে অঙ্গীভূত করণ ;

ঘ) আদিবাসীদের দেশ থেকে বিতাড়ন।

পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসী জনগোষ্ঠীদের ইতিহাস এবং ঐতিহ্য অনেক দিনের পুরনো। ষোড়শ শতাব্দীতে এই উপমহাদেশে দোর্দণ্ড প্রতাপশালী মোগল সাম্রাজ্যের বাইরে ছিল এই পার্বত্য চট্টগ্রাম। তখন পার্বত্য চট্টগ্রামের নাম ছিল কার্পাস মহল। মোগল কর্তৃপক্ষ এখান থেকে Voluntary Contribution হিসেবে বাৎসরিক কয়েকশ মণ কার্পাস তুলা নিতেন মাত্র। এই অঞ্চলের অভ্যন্তরীণ কোনো ব্যাপারে মোগল কর্তৃপক্ষ হস্তক্ষেপ করতেন না– তাই আদিবাসীগণ একপ্রকার স্বাধীনই ছিলেন। অষ্টাদশ শতাব্দীতে বৃটিশেরা মোগলদের পরাজিত করে উপমহাদেশে রাজত্ব কায়েম করলে ক্রমে ক্রমে পার্বত্য চট্টগ্রামে নিজেদের

শাসন বিস্তার করে। তবে বৃটিশরা পার্বত্য চট্টগ্রামকে একটি বিশেষ মর্যাদায় শাসন করে। ১৯০০ সালে প্রবর্তিত পার্বত্য চট্টগ্রাম শাসনবিধি একটি ঐতিহাসিক শাসনতাত্রিক আইনি দলিল হিসেবে স্বীকৃত। বৃটিশ ভারতে ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইন পার্বত্য চট্টগ্রামের ন্যায় অধিবাসী অধ্যুষিত জেলা শাসন বহির্ভূত বা পৃথক শাসিত এলাকা রূপে বহাল থাকে। ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান হওয়ার পর ১৯৫৬ সালে প্রণীত পাকিস্তানের প্রথম সংবিধানে পার্বত্য চট্টগ্রামের Excluded Area বা শাসন বহির্ভূত এলাকার মর্যাদা সংরক্ষণ করা হয়। ১৯৬২ সালে প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান কর্তৃক প্রবর্তিত সংবিধানে তৎকালীন পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রশাসনিক মর্যাদা Excluded Area থেকে পরিবর্তিত করে Tribal Area করা হয়। আবার ১৯৬৩ সালে উক্ত সংবিধানের এক সংশোধনী আইন বলে (১৯৬৪ সালের আইন নং ১) ১৯৬৪ সালের ১০ই জানুয়ারি থেকে পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতীয় এলাকার Tribal Area মর্যাদা বাতিল এবং ১৯০০ সালে Chittagong Hill Tracts Manual রহিত করা হয়। তবে উপজাতীয় প্রধান বা Circle Chief দের আবেদনের প্রেক্ষিতে সংবিধানের উপরোক্ত সংশোধনী পাকিস্তান আমলে কার্যকর করা হয়নি। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পার CHT Regulation বা CHT Manual (1900) বলবৎ করা না হলেও নির্বাহী আদেশে তা বলবৎ রাখা বা করা হয়েছে।

বাংলাদেশ সংবিধানের ৯ ও ২৮ (৪) ধারার উপর ভিত্তি করে ১৯৮৯ সানে বিভিন্ন অনগ্রসর উপজাতি অধ্যুষিত পার্বত্য জেলাসমূহের সর্বাঙ্গীন উন্নয়নকল্পে পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ আইনসমূহ (১৯৮৯ সনের ১৯, ২০, ২১ নং আইন) অনুযায়ী পার্বত্য জেলা পরিষদ স্থাপিত হয়। ১৯৯৭ সালের ২রা ডিসেম্বর পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক জাতীয় কমিটির এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির মধ্যে পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তি চুক্তি সম্পাদিত হয়েছে। পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তি চুক্তির আলোকে তিন পার্বত্য জেলা পরিষদসমূহের কার্যক্রমের সমন্বয় সাধন করার জন্য ১৯৯৮ সালে পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ প্রতিষ্ঠিত ও চালু হয়েছে।

পার্বত্য চট্টগ্রাম বাংলাদেশের অবিচ্ছেদ্য একটি অংশ। তা সত্ত্বেও এতদ্‌অঞ্চলের প্রশাসনিক ব্যবস্থা বাংলাদেশের অপরাপর অঞ্চল থেকে পৃথক। এর প্রধান কারণ হচ্ছে এখানকার ঐতিহ্যবাহী. প্রশাসনিক ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য। বর্তমানে চট্টগ্রামে তিনটি প্রশাসনিক ধারা চালু রয়েছে।

১. ঐতিহ্যবাহী প্রশাসনিক ব্যবস্থা ঃ

ক) সার্কেল চীফ বা রাজা
খ) হেডম্যান বা মৌজা হেডম্যান
গ) কারবারী বা গ্রাম কারবারী

২. সাধারণ প্রশাসনিক ব্যবস্থা ঃ

ক) জেলা প্রশাসক
খ) উপজেলা পরিষদ
গ) ইউনিয়ন পরিষদ
ঘ) গ্রাম সরকার

ঙ) পৌরসভা

৩. স্বায়ত্তশাসিত সরকার পদ্ধতি ঃ

ক) পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ

খ) পার্বত্য জেলা পরিষদ

১৯৯৭ সালের ২রা ডিসেম্বর পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তি চুক্তি সম্পাদিত হলেও অদ্যাবধি পুরোপুরি শান্তিচুক্তির ধারা বাস্তবায়ন না হওয়ায় আদিবাসী জনগণের সমস্যা ও সংকটের নিরসন হয়নি।

আদিবাসীদের সম্ভাবনা ঃ ১৯৯৩ সালের ৯ই আগস্ট জাতিসংঘ কর্তৃক আন্তর্জাতিক আদিবাসী দিবস ঘোষণা করার পর থেকে পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসীদের মধ্যে নতুন করে সচেতনতার শুরু হয়। ১৯৯৩ সাল থেকে বাংলাদেশের সকল আদিবাসী জাতিগোষ্ঠী ও তাদের সদস্য-সদস্যাদেরকে সমষ্টিগতভাবে ইংরেজিতে 'Indigenous' ও বাংলায় 'আদিবাসী' হিসাবে অভিহিত করার রেওয়াজ শুরু হয়ে গিয়েছে। বর্তমানে বাংলাদেশে প্রান্তীয় জনগণ আর কেউ উপজাতি (Tribal) নয়, পার্বত্য চট্টগ্রামের সকল জুম্ম জনগণ আদিবাসী নামে অভিহিত। ২০০৫ সালের ডিসেম্বরে বাংলাদেশ সরকার জাতীয় দারিদ্র্য বিমোচন কৌশল পত্র (PRSP) প্রণয়ন করেছে। এই কৌশলপত্রে আদিবাসীদের প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ ও অধিকার লঙ্ঘণের কথা বলা হয়েছে। তদুপরি PRSP তে আদিবাসীদের বাংলায় 'আদিবাসী' এবং ইংরেজিতে Ethnic Minority হিসাবে অভিহিত করা হয়েছে। বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, Indigenous ও aboriginal শব্দগুলি বিভিন্ন বাংলাদেশী আইনে রয়েছে, যেমন ১৯০০ সালের পার্বত্য চট্টগ্রাম রেগুলেশনে, ১৯৫০ সানের ভূমি অধিকার ও প্রজাসত্ত্ব আইনে এবং ১৯৯৫ সনের অর্থ আইনে। মহামান্য সুপ্রীম কোর্টে হাইকোর্ট বিভাগও পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসীদের Indigenous hillman হিসেবে গ্রহণ করেছে। মহামান্য সুপ্রীম কোর্টের আপীল বিভাগও একটি রায়ে পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসীদের প্রথাগত আইনের ব্যাপারে সরকার বা আদালত কর্তৃক কোনো ধরনের হস্তক্ষেপ না করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

বর্তমান প্রেক্ষাপটে পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসীদের বিষয় সীমিত পরিসরে বিচার করার সময় আর নেই, তা অতীত হয়ে গিয়েছে। এখন তাদের বিষয় এবং বিচরণ ক্ষেত্র দেশের সীমানা পেরিয়ে আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে পরিব্যপ্ত হয়েছে। বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরাম গঠিত হলে প্রথম থেকে ফোরামের সম্মানিত চেয়ারম্যান পদে রত আছেন পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির সভাপতি, আঞ্চলিক পরিষদের মাননীয় চেয়ারম্যান, সংগ্রামী জনগণের প্রাণপ্রিয় নেতা শ্রী জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা। জাতিসংঘের মানবাধিকার পরিষদের বিশেষ Working group এর Indigenous peoples Cansus অন্যতম Co-Chairperson নির্বাচিত হয়েছেন জনগণের প্রিয় নেতৃত্ব চাকমা রাজা ব্যারিস্টার দেবাশীষ রায়। দেশে ও দেশের বাইরে আদিবাসী নেতৃত্বের সম্মানজনক ঐ উপস্থিতি পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসীদের জন্য অমিত সম্ভাবনার স্মারক।

১৯৯৫ সাল থেকে ২০০৪ সাল জাতিসংঘ কর্তৃক ঘোষিত প্রথম আদিবাসী দশক শেষ হয়ে গিয়েছে। এই দশকে এ যাবত আদিবাসী সম্পর্কীয় যেসব ঘোষণা পত্র প্রকাশিত

হয়েছে সেখানে আদিবাসীদের মানবাধিকার ও মৌলিক স্বাধীনতার কথা স্বীকার করা হয়েছে। অন্যান্যের মধ্যে নিম্নোক্ত বিষয়সমূহ সন্নিবেশ করা হয়েছে ঃ

ক) আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার (right to unrestricted self determination) ;

খ) সমষ্টিকগত মালিকানার অধিকার ;

গ) ভূমি, ভূখণ্ড ও অন্যান্য প্রাকৃতিক সম্পদের ব্যবহার ও নিয়ন্ত্রণের অধিকার এবং

ঘ) সাংস্কৃতিক ও বুদ্ধিবৃত্তি সম্পদ (intelectual property) সংরক্ষণের মাধ্যমে আদিবাসীদের নিজস্ব রাজনৈতিক, ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের বজায় ও উন্নয়নের অধিকার।

আদিবাসী জনগণের উপর, তাদের সম্পত্তি ও ভূখণ্ডের উপর প্রভাব ফেলে এমন যে কোনো কাজের ক্ষেত্রে তাদের স্বাধীন পূর্ব সম্মতি নেয়ার কথা ও তাদের কার্যকরী অংশগ্রহণের নিশ্চয়তার কথা রয়েছে।

বর্তমানে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে জাতিসংঘ কর্তৃক ২০০৫ সাল থেকে ২০১৪ সাল পর্যন্ত আদিবাসীদের জন্য দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক আদিবাসী দশক ঘোষণা দেওয়া। এর মূল Theme নির্ধারিত হয়েছে Partnership in Action with Dignity. আর একটি গুরুত্বপূর্ণ মানবাধিকার পরিষদ কর্তৃক আদিবাসী অধিকার সংক্রান্ত খসড়া অনুমোদন ও ২০০৬ সনের জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে শীতকালীন অধিবেশনে চূড়ান্তভাবে গ্রহণের জন্য প্রেরণ। ঘোষণাপত্রে স্বীকৃত গুরুত্বপূর্ণ অধিকারসমূহের মধ্যে রয়েছে আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকার, রাষ্ট্রের সাথে আদিবাসীদের চুক্তি (treaties, agreements and other constructive arrangements) বাস্তবায়নের অধিকার, সেনা শাসন ও সামরিকীকরণের বিরুদ্ধে রক্ষামূলক ব্যবস্থার অধিকার, বেদখলকৃত ভূমি পুনরুদ্ধারের অধিকার এবং সর্বোপরি সকল প্রকার বৈষম্যমূলক আচরণের অবসানের অধিকার।

উপসংহার ঃ বিশ্বে বৈষম্যহীন মানব সমাজ ও নিরবচ্ছিন্ন শান্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে জাতিসংঘ কর্তৃক যে যে পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে, তন্মধ্যে আন্তর্জাতিক আদিবাসী ফোরাম গঠনক্রমে তার মাধ্যমে বিশ্বের সকল আদিবাসীদের Partership in Action with Dignity এর ব্যবস্থা করা হয়েছে এবং আদিবাসীদের অধিকার সংক্রান্ত খসড়া (দলিল) প্রণয়ন ও অনুমোদন করতঃ তা জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে ২০০৬ সালের শীতকালীন অধিবেশনে চূড়ান্তভাবে গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হয়েছে। সে যাই হোক, জাতিসংঘের এই মহতী উদ্যোগের ফলে বিশ্বের ৭০টি দেশে অবস্থানরত ৩০ কোটি আদিবাসী জনগণকেও স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র ক্ষমতার অধিকারী মানুষের ন্যায় সকল অধিকার ও মর্যাদার অধিকারী করা হয়েছে। ..এটা কি বিপুল আনন্দের বিষয় নয় যে, বাংলাদেশের বা পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসী জনগণও সেই ৩০ কোটি আদিবাসী জনগণের অংশীদার বা অংশ?

আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটে আদিবাসীদের জন্য যে সুযোগ ও সম্ভাবনার দুয়ার উন্মোচিত হয়েছে, আমাদের (পার্বত্য চট্টগ্রামের) আদিবাসীদের সে সুযোগ এবং সম্ভাবনাকে অবশ্যই স্বাগত জানাতে হবে। সক্রিয়ভাবে সে সবের সঙ্গে আমাদের একাত্মতা ঘোষণা করতে হবে। পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসীদের আশাবাদী হওয়ার মতো ইতোমধ্যে অনেক কিছু অর্জিত হয়েছে। আর্থসামাজিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক, ধর্মীয় এবং জীবনের অন্যান্য

ক্ষেত্রে যেমন, আইনের ক্ষেত্রে, সাহিত্য ক্ষেত্রে, শিল্প ক্ষেত্রে, আধুনিক প্রযুক্তির ক্ষেত্রে আমরা দেশের নাগরিক হিসেবে এযাবত অনেক কিছু অর্জন করেছি। এখন এই অর্জনকে মূল্যায়ন করার সময় এসেছে, এই অর্জনকে ধারণ করে রাখতে হবে। লক্ষ্য করা গেছে, সবকিছু আছে, অনেককিছু আছে, কিন্তু মনস্তাত্ত্বিকভাবে আমাদের যেন কিছুই নেই– আমাদের মনস্তাত্ত্বিকভাবে পশ্চাদপদতা, মনস্তাত্ত্বিক শূন্যতা আমাদের কাটিয়ে উঠতে হবে। আমাদের আশা-আকাঙ্ক্ষা, স্বপ্ন-সাধনাকে বাস্তবে পেতে হলে আমাদের সর্বপ্রথমে মনস্তাত্ত্বিক বিজয় অর্জন করতে হবে। আমাদের মনে রাখতে হবে এবং এ ধারণা জিইয়ে রাখতে হবে যে, জাতিসংঘ আমাদের সেই অধিকার দিয়েছে যে অধিকার স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্রশক্তির অধিকার– নাগরিকেরা ভোগ করে থাকে– সেই অধিকার। তবে তজ্জন্য আমাদের কাজকে অব্যাহত রাখতে হবে। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ্য যে, জাতিসংঘের এযাবত গৃহীত সকল প্রস্তাবনা বা ঘোষণায় বাংলাদেশ অংশগ্রহণ বা স্বাক্ষর করেছে, বাংলাদেশের আদিবাসীদের এই মহতী অর্জনে বাংলাদেশের অবদান অপরিসীম, তাতে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বলতর হয়েছে।

সহায়ক গ্রন্থ :

১. সংহতি ২০০৩, বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরাম
২. সংহতি ২০০৬, বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরাম
৩. মাওরুম জুম ২০০৭, হিল রিসার্চ এন্ড প্রটেকশন ফোরাম জুম লিটারেচার ইয়ং সোসাইটি।

লেখক : পার্বত্য চট্টগ্রামের একজন বিশিষ্ট সাহিত্যিক।

মারমা জাতিসত্তা ঃ নৃতাত্ত্বিক প্রেক্ষিত

ড. মুস্তাফা মজিদ

মারমা ও রাখাইনরা বাঙালিদের কাছে এক সময় 'মগ' নামে অভিহিত ছিলো। মঙ্গোলীয় মানবগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত এই শাখা নৃগোষ্ঠী বাংলাদেশের পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড়ি জনপদ বিশেষ করে বান্দরবানে গুচ্ছভাবে এবং রাঙামাটি ও খাগড়াছড়িতে বিচ্ছিন্নভাবে ছড়িয়ে ছিটিয়ে বসবাস করে। আর এরা মারমা নামে নিজেদের পরিচয় দেয়। অন্যদিকে কক্সবাজার, পটুয়াখালী ও বরগুনায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে সমুদ্র উপকূলের সমতলে বসবাসরত এই নৃগোষ্ঠী নিজেদের রাখাইন নামে পরিচয় দিয়ে থাকে। পাহাড়ি এবং সমতলের অধিবাসী এই দুই ধারার জনগোষ্ঠীই নিজেদেরকে 'মগ' পরিচয় দিতে অপছন্দ করে।

যদিও মধ্যযুগে বাংলাদেশের সমুদ্র উপকূলে মগ, ফিরিঙ্গী ও পর্তুগীজ জলদস্যুদের উৎপাত ও অত্যাচারে অতিষ্ঠ ছিলো এ দেশের জনগণ এবং তাদের অত্যাচারের বিস্তৃতি ছিলো দেশের অভ্যন্তর পর্যন্ত। তথাপি সেই মগ জলদস্যুদের উত্তরসূরি বর্তমান রাখাইন ও মারমারা যে নয়, সেই সত্য ঐতিহাসিকভাবে প্রমাণিত হয়েছে।

মারমাদের সভ্যতার ইতিহাস কয়েক হাজার বছরের পুরানো। তাদের প্রাচীন সভ্যতার নানা নিদর্শন যেমন আবিষ্কৃত হয়েছে তেমনি মারমা ও রাখাইনদের জাতিগত ঐতিহ্য ও কৃষ্টি যে একটি ধারাবাহিক পথ পরিক্রম করে অতিক্রম করেছে এ কথা বলার অপেক্ষা রাখে না। 'মারমা' কিংবা 'ম্রাইমা' নামের একটি জনগোষ্ঠী বা জাতিসত্তার অস্তিত্ব প্রাচীনকালেও ছিলো, এর প্রমাণ মেলে বিভিন্ন তথ্য সূত্রে।

প্রাচীনকালে উত্তর ভারতের মগধ থেকে আগত বলে আরাকানী এই জনগোষ্ঠীর নাম অপভ্রংশাকারে 'মগ' হয়েছে বলে বিভিন্ন পণ্ডিত অভিমত ব্যক্ত করেন। প্রাচীন পুঁথিপত্র, পাণ্ডুলিপি ও শিলালিপিতে এ রকম প্রমাণ লিপিবদ্ধ রয়েছে। তথাপি এই জনগোষ্ঠীর লোকেরা 'মগ' পরিচয় দিতে নিজেদের ঘৃণা বোধ করেন। সম্ভবত মগ জলদস্যুদের দস্যুবৃত্তির যে দুর্নাম তার দায়ভার তারা নিতে অপারগ বলেই। আগেই উলি-খিত হয়েছে যে, মগ জলদস্যুদের সাথে বর্তমান রাখাইন বা মারমা জনগোষ্ঠীর কোন যোগসূত্র নেই। বাংলাদেশের বর্তমান মারমা ও রাখাইন জনগোষ্ঠী মূলত এ দেশে অভিবাসী। তবে অভিবাসনের আগত স্থান ও সময়কাল নিয়ে মারমা ও রাখাইনদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে।

বান্দরবান, রাঙামাটি ও খাগড়াছড়িতে বসবাসরত ১৪টি জাতিগোষ্ঠীর মধ্যে বর্মীভাষী মারমারা দ্বিতীয় সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগোষ্ঠী। প্রধান সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগোষ্ঠী চাকমা। তবে, বান্দরবান পার্বত্য জেলায় মারমারা সংখ্যাগরিষ্ঠ। অন্যান্য জাতিগোষ্ঠীর মধ্যে রয়েছে ম্রো, ত্রিপুরা, তঞ্চঙ্গ্যা, বম, খুমী, খেয়াং, চাক, গোর্খা, আসা, রাখাইন, পাংখোয়া ও লুসাই। এ

সকল জনগোষ্ঠীও মঙ্গোলীয় নৃগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত। তবে, এদের ভাষা ও সংস্কৃতি আলাদা।

পৃথিবীর অধিকাংশ অধিবাসী মঙ্গোলীয় মানবগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত। চীন, জাপান, কোরিয়া, মঙ্গোলিয়া, ভিয়েতনাম, লাওস, কম্বোডিয়া, ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া, ফিলিপাইন, সিঙ্গাপুর, থাইল্যান্ড, মায়ানমার, তিব্বত, নেপাল, ভারতের পূর্বাঞ্চলের সাতটি রাজ্য, সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়নের বিভিন্ন রাজ্য ও সাইবেরিয়া অঞ্চল, কানাডার এস্কিমোরা, লাতিন আমেরিকা ও আমেরিকার রেড ইন্ডিয়ানরা মঙ্গোলীয় নৃগোষ্ঠীর মানবকুল।

মঙ্গোলীয় নৃগোষ্ঠী (Mongoloid) বা খাড়া চুলের (Leiotrichi) নৃগোষ্ঠীর মানুষদের চুল হয় সোজা, খড়খড়ে ও কালো। মাথার আকার হয় সাধারণত গোল। নাক মাঝারি হতে চ্যাপ্টা, তবে নিগ্রোয়েডদের মতো মাংসল নয়। চোখের উপরের পল-ব ঝুলে থাকে সামনের দিকে। চোখের পাতায় থাকে বিশেষ ধরনের ভাঁজ, যাকে বলা হয় এপিক্যান্থিক ফোল্ড (Epicanthic fold)। কিন্তু নাকের গোড়া অক্ষিকোটর থেকে যথেষ্ট উন্নত নয়, কিন্তু কপোলতলের হাড় প্রশস্ত ও উন্নত বলে মুখ দেখে মনে হয় সমতল। মঙ্গোলীয়দের দাড়ি, গোঁফ থাকে না বললেই হয়। চোখ ধূসর বা গাঢ় ধূসর। গায়ের রঙ পীতাভ বা পীতাভ-বাদামি। দেহাবয়ব দীর্ঘ ও বিস্তৃত হলেও পা খাটো বলে এদের খর্বাকৃতি দেখায়। বাঙালিদের সঙ্কর বৈশিষ্ট্যের সাথে মঙ্গোলয়েডদের স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যকে সমতুল করা যায় না।

বাংলাদেশের পার্বত্য অঞ্চল বিশেষ করে বান্দরবান, রাঙামাটি, খাগড়াছড়ি জেলার ১২টি জাতিগোষ্ঠী, বৃহত্তর ময়মনসিংহ অঞ্চলের নেত্রকোনা, জামালপুর, শেরপুর ও মধুপুরগড়ের গারো ও হাজং এবং কক্সবাজার, পটুয়াখালী ও বরগুনার রাখাইনরা মঙ্গোলীয় মানবগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত। অন্যদিকে বৃহত্তর সিলেট অঞ্চলের মনিপুরী ও খাসিয়া এবং উত্তরবঙ্গের কোচ ও রাজবংশীরা মঙ্গোলীয় মানবগোষ্ঠী।

বিভিন্ন রাষ্ট্রের মঙ্গোলীয় মানবগোষ্ঠীর ভিন্ন ভিন্ন জাতিসত্তার ভাষা, সংস্কৃতি, ধর্ম, আচার-আচরণ ইত্যাদি ভিন্ন ভিন্ন নিঃসন্দেহে। তেমনি বাংলাদেশে বসবাসকারী বিভিন্ন মঙ্গোলীয় জনগোষ্ঠীর ভাষা, সংস্কৃতি, ধর্ম, আচার-আচরণ ভিন্ন ভিন্ন। আর বৃহত্তর পার্বত্য চট্টগ্রামে বসবাসরত মারমাদের ভাষা, সংস্কৃতি, ধর্ম ও আচার-আচরণও অন্যান্য নৃগোষ্ঠী থেকে ভিন্নতর।

তবে মারমা ও রাখাইনদের ভাষা, সংস্কৃতি, ধর্ম ও আচার-আচরণ এক হলেও তারা ভিন্ন ভিন্ন নামে পরিচয় বহন করতেই পছন্দ করে। এ ব্যাপারে তাদের মধ্যে ঐকমত্য নেই। তাদের মধ্যে আন্তঃবিবাহের সম্পর্কও রয়েছে। তবে, একদল পাহাড়ি অন্যদল সমতলের অভিবাসী। আর অভিবাসী হিসেবে আগমনের পটভূমি ও পূর্ব পুরুষদের পরিচয়ের ভিন্নতা দাবি করে এ দু'গোষ্ঠীর মানুষেরা।

সে যাই হোক, বলা হয়ে থাকে যে, মারমা ও রাখাইনরা আরাকানের আদি অধিবাসী আরাকানী। আরাকানীরা প্রাচীনকাল হতেই বাঙালিদের কাছে 'মগ' নামে অভিহিত। যদিও রাখাইন ও মারমাদের মাঝে নানা মত পার্থক্য বিদ্যমান তথাপি তারা নিজেদের 'মগ' অভিধায় অভিহিত হতে দিতে কিছুতেই রাজি নয়, এ ব্যাপারে তাদের মধ্যে ঐকমত্য রয়েছে। আর ইদানীংকালে বাঙালিরা মারমা ও রাখাইনদের আর আগের মতো 'মগ' অভিধায় অভিহিত করে না।

প্রাচীনকাল থেকেই আরাকান এবং বাংলার মধ্যে একটি ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। ইতিহাসের বিভিন্ন কালপর্বে আরাকান থেকে দফায় দফায় আরাকানী জনগোষ্ঠী বাংলার দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলে এসে বসতি স্থাপন করেন। বসতি স্থাপনকারী জনগোষ্ঠীর বড় একটি অংশই ছিল মারমা ও রাখাইন। যাদেরকে সাধারণভাবে 'মগ' নামে অভিহিত করা হতো।

আগেই উলি-খিত হয়েছে যে, বাংলাদেশে মারমা ও রাখাইনদের প্রধান আবাসস্থল হচ্ছে বান্দরবান, কক্সবাজার, পটুয়াখালী ও বরগুনা জেলা। তবে রাঙামাটি ও খাগড়াছড়ি জেলাতেও কিছু কিছু মারমার দেখা পাওয়া যায়। যারা মূলত পার্শ্ববর্তী ব্রহ্মদেশ থেকে এ দেশে আগমন করেছে। বাংলাদেশে বসবাসরত মগদের আমরা দু'ভাগে ভাগ করতে পারি। এর একটি অংশ পাহাড়ে এবং অন্য অংশটি সমতল ভূমিতে বসবাস করে। এটি নিশ্চিত করে বলা যায় যে, মারমা ও রাখাইনদের নিজ নিজ গোষ্ঠীগত পরিচয় যাই থাকুক না কেন, ঐতিহাসিকদের মতে তারা মূলত আরাকানী জনগোষ্ঠী থেকেই এ দেশে এসেছে এবং জাতিগোষ্ঠী হিসেবে সংখ্যালঘুত্বে পরিণত হয়েছে। জাতিগোষ্ঠীগুলো সাধারণভাবে দু'ধরনের অভিধায় অভিহিত হয়ে থাকে। প্রথমত, তারা যে অঞ্চলে বসবাস করেন সেই অঞ্চলের আশপাশের ভিন্ন জনগোষ্ঠীর জনগণ তাদের গোষ্ঠীগত নামকরণ করেন। অন্যদিকে জাতিগোষ্ঠীগুলো নিজেরাই নিজেদের পরিচিতিমূলক একটি নাম ব্যবহার করেন। এ দু'ধরনের নামকরণই নির্দিষ্ট একটি জাতিগোষ্ঠীর বিশেষ কিছু বৈশিষ্ট্যের ধারক। এর বাইরেও মাঝে মাঝে জাতিগোষ্ঠীগুলোর নির্দেশের জন্যে কিছু কিছু অভিধা ও শব্দ ব্যবহার করা হয়ে থাকে। তবে বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর লোকেরা মনে করেন এসব শব্দ বা অভিধা তাদের জন্য অসম্মানজনক। বিশেষ করে রাখাইন ও মারমাদের 'মগ' অভিধায় অভিহিত করলে তারা খারাপ প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেন। তৎসত্ত্বেও মারমা ও রাখাইন এই দুই জনগোষ্ঠী নিয়ে অধ্যাপক আবদুল মাবুদ খান রচিত তাঁর গবেষণা গ্রন্থের নাম রেখেছেন *The Maghs* (UPL, Dhaka, ১৯৯৯)। নিন্দিত শব্দ দিয়ে বইয়ের এভাবে নামকরণ ঠিক নয়, যা বিভ্রান্তিকর ও দুঃখজনক এবং জনগোষ্ঠীদ্বয়কে অপমান করার শামিল।

এ প্রসঙ্গে পুনরায় উলে-খ্য যে, 'মারমা' এবং 'রাখাইন' এই দু'টি অভিধা বাদ দিলে বাংলাদেশে বসবাসরত পাহাড়ি ও সমতল ভূমির সকল আরাকানী জাতিগোষ্ঠীই দীর্ঘকাল থেকে সাধারণভাবে বাঙালিদের মাঝে 'মগ' নামে পরিচিত। যদিও আজকাল 'মগ' নামে অভিহিত করার প্রবণতা খুব একটা লক্ষণীয় নয়। সবাই মারমা ও রাখাইন নামেই অভিহিত করে থাকেন। তবুও, সাধারণের মাঝে 'মগ' শব্দটির আদি উৎস সম্পর্কে সুনির্দিষ্টভাবে কিছু বলা না গেলেও এ কথা ঠিক যে, আরাকান অঞ্চলের বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী জনগোষ্ঠীরাই প্রধানত 'মগ' নামে অভিহিত এবং এ দেশে আগত আরাকানী অভিবাসীরা প্রধানত বাংলাদেশের দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলে বসবাস করে। লেখক পায়ারের মতে 'মগ' শব্দটির উৎপত্তি হয়েছে মগধের শাসকগোষ্ঠীর পক্ষ থেকে। বর্মী ঐতিহ্য থেকে উদাহরণ সংগ্রহ করে তিনি বলেন যে, মগরা ভারতের ক্ষত্রিয় গোষ্ঠীর অন্তর্গত। তারা বাংলার পূর্বাঞ্চল দিয়ে মগধ থেকে ব্রহ্মদেশে প্রবেশ করে। এমনিভাবে পরবর্তীকালে ব্রহ্মদেশ থেকে আরাকান অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে। প্রাচীন যুগে হিন্দু ও বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের বিভিন্ন দল নিজ নিজ ধর্ম বিশ্বাসের মহিমা প্রচারের উদ্দেশ্যে আরাকানে প্রবেশ করেন। এঁদের মধ্যে কেউ কেউ বিভিন্ন সময় সেখানেই

স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন। বিভিন্ন ধর্মের প্রচারমূলক এই প্রতিযোগিতায় শেষ পর্যন্ত বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীরাই ক্ষমতাসীনদের আনুকূল্যে সেখানে স্থায়ীভাবে টিকে যায়। ভারত থেকে আগত যে জনগোষ্ঠীটি স্থানীয় জনগোষ্ঠীর সাথে মিলেমিশে গিয়েছিলেন অনুমান করা যায় তারা বস্তুত বৌদ্ধ ধর্মের তীর্থ ভূমি মগধেরই অধিবাসী ছিলেন। আরাকানের অন্যান্য জনগোষ্ঠীর চাইতে নিজেদের তারা উচ্চ বর্ণের দাবি করেন। ধর্মীয় বিশ্বাসের দিক থেকে তারা ছিলেন সর্বপ্রাণবাদী বা প্রকৃতি উপাসক। অনুমান করা যায় যে, মগধ থেকে আগত জনগোষ্ঠী হতেই 'মগ' শব্দের উৎপত্তির কারণ। যা পরবর্তী সময় আরাকানে বসবাসরত জনগোষ্ঠীর নৃতাত্ত্বিক অভিধা হিসেবে পরিচিতি লাভ করে। দক্ষিণ ভারত এবং আরাকানের উপকূলীয় অঞ্চলের জনগোষ্ঠীর মধ্যে একটি সাংস্কৃতিক মিথষ্ক্রিয়া যে হয়েছে সেই সম্ভাবনার কথাই বা নাকচ করা যায় কিভাবে? এ প্রসঙ্গে হার্ভেকে উদ্ধৃত করে বলা যায় যে, বর্মার নিম্নাঞ্চলে বসবাসরত ভারতীয়রা সমুদ্র পথেই মাদ্রাজ থেকে এসেছিলেন। এ কারণে তেলেইং ও তেলেঙ্গানার মধ্যে একটি যোগসূত্র খুঁজে পাওয়া যায়। উলে-খ্য, তেলেঙ্গানা ভারতের দক্ষিণাঞ্চলীয় রাজ্য অন্ধ্রেরই একটি অঞ্চল। অনুমান করা যায় আরাকান উপকূলবর্তী অঞ্চলে ভারতীয় সংস্কৃতির আগমন ঘটতে শুরু করে খ্রিষ্টপূর্ব কালে। আরাকানের মগধ সংশে-ষের প্রাচীনতম উদাহরণ মধ্য যুগের কবি দৌলতকাজীর রচনায় পাওয়া যায় (১৬২২-৩৮)। দৌলতকাজীর মতে রোসাঙ্গ (আরাকান) রাজারা মগধ রাজপরিবার থেকেই এসেছিলেন। ধর্মীয় বিশ্বাসের দিক থেকে তারা ছিলেন বৌদ্ধ। কবি তাঁর *সতী ময়না লোর চন্দ্রানী* গ্রন্থের বিভিন্ন স্থানে মগধের প্রতি এবং মগধ রাজ্য– এ দু'টি শব্দের মাধ্যমে যথাক্রমে রাজা এবং আরাকান রাজ্যকে বোঝাতে চেয়েছেন। আরাকান রাজাদের উত্তরসূরিকে হয়তো মগধে খুঁজে পাওয়া যাবে। কিন্তু আরাকানের সমগ্র জনগোষ্ঠীই যে মগধ থেকেই এসেছিলেন এ বিষয়টি নিশ্চিত করে বলা যায় না। কেননা, আরাকানীরা প্রথমত মঙ্গোলীয় নরগোষ্ঠী থেকে আগত এবং পরবর্তী সময় তাদের মধ্যে অস্ট্রালয়েড ও অন্যান্য নরগোষ্ঠীর নৃতাত্ত্বিক সংমিশ্রণ ঘটে। কিন্তু 'মগ' নামে কোনো নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠীর সংমিশ্রণ এর মধ্যে ছিল না। সম্ভবত বাংলাদেশে বসবাসরত আরাকানীরা দাবি করেন যে, আরাকান অঞ্চলে 'মগ' নামে তাদের কোনো পূর্ব-পুরুষদের অস্তিত্ব ছিল না। আর এ জন্যেই তারা 'মগ' নামে অভিহিত হওয়াকে প্রচণ্ডভাবে বিরোধিতা করেন। তাদের মতে 'মগ' শব্দটি জলদস্যুতা, লুণ্ঠন ও অরাজকতারই নামান্তর। তারা উলে-খ করেন যে, মধ্যযুগে পর্তুগীজ জলদস্যুদের সাথে মিলেমিশে নেহাতই জীবন ধারণের প্রয়োজনেই কতিপয় আরাকানী পেশাগতভাবে জলদস্যুর কাজে লিপ্ত হয়েছিল। কিন্তু এ কারণে সম্পূর্ণ আরাকানী জনগোষ্ঠীকে অভিযুক্ত করা ঠিক হবে না। সামগ্রিক বিচারে তারা সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ও তাদের স্থাপত্য নিদর্শনসমূহই এই দাবির যৌক্তিকতা ও ঐতিহাসিকতাকেই প্রমাণ করে। তবে এর বাইরে চতুর্দশ শতকের শুরু থেকে অষ্টাদশ শতকের প্রথমার্ধ পর্যন্ত অর্থাৎ ১৭২৭ সালের জুন মাসে মুরশিদ খুলি খাঁ'র মৃত্যু পর্যন্ত আরাকানীদের একটি ক্ষুদ্র অংশ ব্রহ্মদেশ ও বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চলের জলদস্যুতা ও লুণ্ঠন কাজের সাথে জড়িত ছিল যা আগেই উলে-খ করা হয়েছে।

তারা এমনও দাবি করেন যে অন্য জাতিসত্তার মানুষেরা তাদেরকে বিভিন্ন সময় যে সকল অভিধায় অভিহিত করেছেন তা যথেষ্ট পরিমাণ ভুল বোঝাবুঝির সৃষ্টি করেছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, বর্মায় বসবাসরত ভারতীয় জনগোষ্ঠীর লোকেরা কোলা (কুলা) নামে অভিহিত। এই কোলা শব্দটি ভারতীয় (সংস্কৃত এবং সাংস্কৃতিক) কুলা শব্দ থেকে উদ্ভূত। শব্দটিকে বর্মীরা উচ্চতর মর্যাদাসম্পন্ন বলে বিবেচনা করেন। কিন্তু ভারত থেকে আগত এই জনগোষ্ঠী নিজেদেরকে কোলা হিসেবে পরিচয় দিতে পছন্দ করেন না। তারা মনে করেন এই শব্দটি তাদের নিজেদের কালো গাত্রবর্ণের পরিচয়বাহী। একইভাবে বাংলাদেশে বসবাসরত আরাকানীরা মনে করে 'মগ' শব্দটি হচ্ছে দস্যুতাজ্ঞাপক। যদিও ব্যুৎপত্তিগতভাবে শব্দটি দিয়ে একজন ব্যক্তির ক্ষত্রিয় এবং মগধীয় ঐতিহ্যকেই প্রকাশ করা হয়। বাংলাদেশের পার্বত্য এলাকায় বসবাসরত আরাকানীরা নিজেদের 'মারমা' বলে পরিচয় দেয়। নিশ্চিতভাবে বলা না গেলেও সাধারণ মত হচ্ছে এই যে, মায়াম্মা (Maymma) শব্দ থেকেই 'মারমা' শব্দের উৎপত্তি। আর 'মিইয়ান' বলতে বোঝায় মানুষ। নাম বা অভিধা যাই থাক না কেন বর্মী ও চীনাদের মধ্যেকার সম্পর্ক অস্বীকার করবার কোনো উপায় নেই। কৌতূহল উদ্দীপক ঘটনা এই যে– বর্মার পূর্বাঞ্চলে বসবাসরত শানস্ জনগোষ্ঠী নিজেদের দেশকে মানুষের দেশ (Country of man) বা মানবের দেশ (Country of human) চিহ্নিত করে থাকেন। ভারত ভূখণ্ডে বসবাসরত মনিপুরীরা বর্মীদের মিরান (Miran) বলে ডাকেন। অন্যদিকে বর্মার কচিন (Kachin) এবং ম্রুউ (Mru) জনগোষ্ঠীর লোকেরা বর্মায় বসবাসরত অন্যান্য বর্মীদেরকে মাইয়েঙ বলে ডাকেন। অন্যদিকে পালাউঙ নামে বর্মায় অন্যতম একটি উপজাতি নিজেদেরকে বিরাণ হিসেবে পরিচয় দেন।

যাই হোক, উলি-খিত এসব শব্দ মঙ্গোলীয় নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠীর সঙ্গে সম্পর্কিত। কিছু আরাকানী নিজেদেরকে মারমা হিসেবে পরিচয় দিয়ে থাকেন। কিন্তু তারা বলে থাকেন যে, মূল আরাকানের সঙ্গে তাদের কোনো যোগসূত্র বা সম্পর্ক নেই। পরিচয় বহনকারী আরাকানীদের চাইতে নিজেদের তারা আলাদা ভাবেন, বরং তারা পরিচয় বহনকারী বর্মার মূল স্রোতের অংশ হিসেবেই নিজেদের মনে করেন। তারা দাবি করেন যে, ইতিহাসের কোনো এক কাল পর্বে তাদের পূর্বপুরুষেরা বর্মা ছেড়ে আরাকানে এসে বসবাস শুরু করেন। আর পরবর্তী সময় জীবন-যাপনের তাগিদে ও নানান কারণে বাংলাদেশের কতিপয় অঞ্চলে তারা বসতি গড়ে তোলেন। তারা এও উলে-খ করেন যে, আরাকান রাজ্য বহু আগেই ইতিহাসের গহ্বরে বিলীন হয়ে গেছে। কিন্তু সামগ্রিক অর্থে বর্মা (মায়ানমার) ইতিহাস ও প্রগতির একটি বাস্তব রাষ্ট্র হিসেবে টিকে আছে। যার রাজধানী রেঙ্গুন বা ইয়াঙ্গুন। আর রেঙ্গুন বর্তমানে মায়ানমারের অঙ্গরাজ্য আরাকানের সদর আকিয়াবের চাইতে সবদিক থেকেই এগিয়ে আছে এবং ভবিষ্যতেও এগিয়ে থাকবে।

মিন ছোয়া পু (Min Soa Pyu) নামে মারমাদের এক পূর্ব পুরুষ সপ্তদশ শতকে চট্টগ্রাম অঞ্চলের গভর্নর ছিলেন। তাঁর উপাধি ছিল বোমাং (Bohmaung)। যার অর্থ হলো কমান্ডার। তিনি তৎকালীন আরাকান রাজ্যের খুবই প্রিয়পাত্র ছিলেন। বোমাং রাজার উদ্যোগে আবারও মারমা শব্দটি বাংলাদেশে বসবাসরত উপজাতীয় জনগোষ্ঠীর মধ্যে জনপ্রিয় হয়ে উঠতে শুরু করেছিল। তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান সরকারের সঙ্গে বোমাং রাজার

সখ্যতার বিষয়টি সকলেরই জানা ছিল। তারা এটি করেছিলেন মূলত বর্মার সাথে একটি বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে।

পাশাপাশি এটি সত্য যে, বান্দরবান, রাঙামাটি ও খাগড়াছড়ির পাহাড়ি মারমা'রা অনেকেই নিজেদের আরাকানী জাতিগোষ্ঠীর উত্তরাধিকার বলে মনে করেন না। তারা বর্মা থেকে আগত বর্মী রাজের উত্তরাধিকার বলে নিজেদের মনে করেন। যাদের অধিকাংশের বাস বান্দরবানে। এর পক্ষে তারা অনেক যুক্তি প্রমাণও উপস্থাপন করে থাকেন। তৎসত্ত্বেও ইতিহাসের আলোকে তাদেরকে আরাকানী বংশোদ্ভূত হিসেবেই বিবেচনা করা বাঞ্ছনীয় হবে। উলে-খ্য যে, একটি বৃহৎ জনগোষ্ঠী একটি রাজপরিবারের উত্তরাধিকার কিভাবে হতে পারে– এ প্রশ্ন যেমন আছে, তেমনি তারা যে বর্মী রাজের উত্তরাধিকার সে বিষয়ে এ যাবৎকাল কোনো তথ্যনিষ্ঠ দলিল ও উপাত্ত উপস্থাপিত হয়নি। এ নিয়ে নানা বিতর্ক আছে।

বিতর্কে যাই থাকুক বাংলাদেশের পার্বত্য চট্টগ্রামের মারমারা মূলত একটি ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠী এবং সংখ্যালঘু। প্রকৃতির লীলায় বেড়ে ওঠা অরণ্যচারী মারমারা সহজ-সরল জীবন-যাপন করে। হাসি-খুশী-বিনয়ী ও কর্মঠ এই জনগোষ্ঠীর লোকেরা পার্বত্য চট্টগ্রামে আরও ১১টি জাতিগোষ্ঠীর সাথে সকল সাম্প্রদায়িকতার উর্ধ্বে সুখে-দুঃখে এক সাথে মিলেমিশে যুগ যুগ ধরে বসবাস করে আসছে। সব রকমের কলহ বিবাদ মুক্ত এই জাতি বর্তমানে আর্থ-সামাজিক প্রতিকূল অবস্থানে বিরাজ করছে। পরিবর্তমান ও উন্নয়নমুখী সমাজে তাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার পরিবর্তন জরুরি।

অপরদিকে মারমারা দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে বসবাস করে। প্রান্তীয় পরিস্থিতির কারণে তারা যেমন ভৌগোলিকভাবে বিচ্ছিন্ন তেমনি শিক্ষা-দীক্ষা ও আর্থ-সামাজিক পশ্চাৎপদতা তাদের দিন দিন গ্রাস করছে। বিশেষ করে ভূমিহীনতার কারণে দারিদ্র্য তাদের নিত্যসঙ্গী। এ অবস্থায় বিকল্প কর্মসংস্থানসহ আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে পার্বত্য চট্টগ্রামের মারমা জাতিগোষ্ঠীসহ সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠীকে সম্পৃক্ত করতে না পারলে প্রান্তিক অন্ধকার থেকে আলোর পথে উত্তরণ সম্ভব নয়। সম্ভব নয় তাদের বর্ণাঢ্য কৃষ্টি, ঐতিহ্য তথা সংস্কৃতিকে সংরক্ষণ করা। এ অবস্থায় রাষ্ট্রের নীতি নির্ধারকদের যেমন নানা কর্ম-পরিকল্পনা নিয়ে এগিয়ে আসতে হবে তেমনি মারমাসহ পার্বত্য চট্টগ্রামের সকল জাতিগোষ্ঠীর সচেতন মানুষদেরও এগিয়ে আসতে হবে।

ঐতিহাসিক প্রেক্ষিত ঃ আগেই উলি-খিত হয়েছে যে, জনসংখ্যার দিক থেকে পার্বত্য চট্টগ্রামের মারমারা চাকমাদের পরেই অবস্থান করে। এরা এখানে দ্বিতীয় বৃহত্তম জাতিগোষ্ঠী। মারমাদের সমাজ-সংস্কৃতি, ভাষা, শিল্প-সাহিত্য, আচার-আচরণ, পোশাক-পরিচ্ছদ, খাদ্যাভ্যাস, সামগ্রিক গঠন ও বৈশিষ্ট্য ইত্যাদি অন্যান্য জাতিগোষ্ঠী থেকে অনেকাংশেই পৃথক। আর এ কথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে সমাজ ও সংস্কৃতি, নৃতাত্ত্বিক পরিচয়, ভৌগোলিক ও অর্থনৈতিক অবস্থান একটি জাতির জাতিত্ব পরিচয়ের জন্য গুরুত্বপূর্ণ প্রপঞ্চ। মারমা বা ম্রাইমা নামের এই জনগোষ্ঠীর অস্তিত্ব প্রাচীন এবং এটি প্রমাণিত সত্যনিষ্ঠ উপাত্ত। "আনুমানিক নবম ও দশম শতাব্দীতে ইন্ডিয়ান বৌদ্ধ ধর্মের অনুসারী ও তিব্বতী দ্রাবিড়ীয় গোষ্ঠীভুক্ত 'ম্রাম্মা' নামের এক জাতির প্রাচীন ব্রহ্মদেশের দক্ষিণ অঞ্চলে উপস্থিতির পরিচয় পাওয়া যায়।"[১]

"*ম্রাইমাহ সামইং রাজওয়াং সইক* নামীয় আধুনিক বর্মী ইতিহাসে এও জানা যায় যে, ১৭৮৪ খ্রিষ্টাব্দের শেষ নাগাদ বর্মীরাজ বোদোফায়া সমগ্র আরাকান রাজ্য যেমন– টংগু, পেগু, পাগোঁ, আংওয়া ও প্রোম রাজ্য জয় করে তার অধীনস্থ সকল অধিবাসীকে 'ম্যানমা' নামে অভিহিত করে একটি শক্তিশালী জাতিতে পরিণত করেছিলেন। 'ম্যানমা' শব্দটি বর্মী ভাষায় উচ্চারণে ম্যানমা হলেও আক্ষরিক বানানে 'ম্রাইমা'।" ....অথচ পার্বত্য চট্টগ্রামে বসবাসকারী এই মারমা জনগোষ্ঠী নিজেদের 'মারমা' হিসেবে পরিচয় দিয়ে আসছে আরাকান সম্রাট কর্তৃক চট্টগ্রাম এলাকা শাসনের জন্য প্রেরিত বোমাংরাজ বংশের পূর্ব পুরুষ পেগু রাজ্যের রাজা বিরা নং এর উত্তরসূরি মং চ প্যাই তথা মুসলিম নাম আলী মানিক এর আমল থেকে; অর্থাৎ ১৬১৪ খ্রিষ্টাব্দ থেকে। যদিওবা ব্রিটিশ ও মোঘল শাসক শ্রেণী কর্তৃক এ জনগোষ্ঠীকে 'মগ' নামে অভিহিত করা হয়েছে; তবে স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশে সরকারিভাবে মারমা উপজাতি হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করে।"[২]

বাংলাদেশে মারমা জনগোষ্ঠীর শাসন ব্যবস্থা অনেকটা রাজা কেন্দ্রিক। পার্বত্য চট্টগ্রামে মারমাদের দুটো সার্কেলে দু'জন রাজা। এর মধ্যে বান্দরবানের রাজা হলেন বোমাং রাজা এবং মানিকছড়িতে রাজার নাম মংরাজা। সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থায় রাজার মনোনীত রোয়াজা-ফাইনসী (গ্রাম-প্রধান), চগইং-চেয়ে (হিসাব-নিকাশ ও দলিল দস্তাবেজ প্রস্তুতকারী), দগইং-দমদা রেহসা (দেহরক্ষী ও পুলিশ), তাইংসা-তগংগং (দলনেতা), বোয়াসী (আদেশ-নির্দেশ-ঘোষণাকারী), হেডম্যান-কারবারী (মৌজার রাজস্ব কর আদায়কারী) ইত্যাদি জনবল নিয়ে রাজার সভা পর্ষদ গঠিত। সমাজের শীর্ষে এই শাসক শ্রেণীর অবস্থান। বৌদ্ধ পুরোহিত ভিক্ষুগণ হলো সমাজের সম্মানিত ও শ্রদ্ধাস্পদ স্তর। ক্ষেত-খামারের শ্রমজীবী, জুমচাষী, বৈদ্য, গণক ও শিল্পস্থাপত্য কর্মীরা হলো প্রজাকুল শ্রেণীভুক্ত। তাই এদের সামাজিক কাঠামো ও শাসন ব্যবস্থাকে অনেকটা সামন্ততান্ত্রিক পদসোপানভিত্তিক (Hierarchial) বলা যায়।[৩]

প্রফেসর পিয়ের ব্যাসানেত এর মতে বাংলাদেশে মারমারা ২১টি গোত্রে বিভক্ত। তবে প্রবন্ধকার জনাব আবদুল হক চৌধুরীর মতে ২২ এবং নৃতাত্ত্বিক ও কবি আবদুস সাত্তারের মতে ১৫টি গোত্রে বিভক্ত বাংলাদেশের মারমা জাতিগোষ্ঠী। তবে বিভিন্ন সূত্র থেকে জানা যায় যে, মারমা জনগোষ্ঠী প্রধানত পেলেংসা, রিগ্রেসা, থংসা, ক্যকফাসা, ফ্রাংসা, মারোসা, খ্যংসা, ওয়েয়ইংসা, দাকছোয়েসা, সাকপ্রেগ্যহসা, রখইংসা ও আওয়োগ্যোইসা এই ১৩টি গোত্রে বিভক্ত। এছাড়াও বোমাং সার্কেলে বসবাসকারী রিগ্রেসা গোত্রের মারমা জনগোষ্ঠীকে ৭টি দল ও ৬টি গোষ্ঠীতে বিভক্ত করা হয়েছে। মারমা পৌরাণিক ও ইতিহাসবিদদের মতে, এই রিগ্রেসা গোত্রের মারমা জনগণ অটইং-দইং, অচুহ-জুহ বিভক্ত হয়ে রিগ্রেখং (শঙ্খ) নদীর তীরে বসতি স্থাপন করে।[৪]

অর্থনৈতিক প্রেক্ষিত ঃ বাংলাদেশের অন্যান্য পাহাড়ি নৃগোষ্ঠীর মত মারমারা জুম চাষের উপর নির্ভরশীল। এছাড়া অরণ্যের নানা প্রাকৃতিক সম্পদ আহরণ করে তারা বেঁচে থাকে। পার্বত্য চট্টগ্রামের অধিকাংশ মারমা পরিবারের প্রধান আয়ের উৎসই এই জুম চাষ ও প্রকৃতি থেকে আহরিত পণ্য। তাদের চাষাবাদ পদ্ধতি আদিম ও প্রকৃতি নির্ভর। প্রাচীনকাল থেকেই পাহাড়ি জনগোষ্ঠীর মানুষেরা প্রকৃতির উপর নির্ভর থেকে চাষাবাদ করে

যেতে পারে। তারপরও মারমা নারী-পুরুষ ইদানীং শিক্ষা-দীক্ষায় আগ্রহী হয়ে উঠছে। তাদের মধ্যে শিক্ষক, চিকিৎসক, প্রকৌশলী, কৃষিবিদ ও অন্যান্য স্নাতক ডিগ্রীধারী শিক্ষিত জনসংখ্যা উলে-খ করার মত।

ভাষা ও শিক্ষা ঃ মারমারা বাংলাদেশে তাদের স্বগোত্রীয় রাখাইনদের মতো নিজস্ব সংস্কৃতি ও ভাষা তথা মারমা সংস্কৃতি ও ভাষার সাধারণ উত্তরাধিকার নিয়েই বাংলাদেশে তাদের বসতি গড়ে তোলে। মারমাদের ভাষার আদিরূপ ভোট ব্রাহ্ম। রাখাইনদেরও তাই। এক্ষেত্রে মারমা ও রাখাইনদের ভাষা অভিন্ন। রাখাইনরা মনে করে তাদের আদিনিবাস যেহেতু আরাকান, সেহেতু তাদের ভাষা আরাকানী বা রাখাইন। অন্যদিকে ভাষা ও বর্ণমালা এক হলেও মারমারা মনে করে তাদের পূর্বসূরিরা যেহেতু বর্মা থেকে আগত সেহেতু তারা বর্মী ভাষার উত্তরাধিকার। এ নিয়ে তাদের আগমনগত ভিন্নতা সত্ত্বেও ভাষার অমিল নেই। তবে ব্যবহারিক বা বলার ক্ষেত্রে কিংবা উচ্চারণে কিছুটা ভিন্নতা পরিলক্ষিত। বাংলা কথ্য ও লিখিত রূপের মতোই। তাই মঙ্গোলীয় উপ ভাষার স্রোতে বহমান বাংলাদেশে অবস্থানরত মারমা ও রাখাইন জনগোষ্ঠীর ভাষা একই ভাষায় গ্রন্থিত হলেও তারা নিজেরা আলাদা বৈশিষ্ট্যের দাবিদার।

মারমারা তাদের নিজস্ব ভাষা শিক্ষা গ্রহণ করে নিজস্ব বৌদ্ধ মন্দির তথা কিয়াং কিংবা গ্রামের টোল বা পাঠশালায়। তবে এ ক্ষেত্রে বাংলাদেশে অবস্থানরত রাখাইনরা অনেকটা অগ্রগামী হলেও মারমারা অনেকটাই পিছিয়ে আছে। মারমাদের অনেকেই বিশেষ করে গ্রামের অধিবাসীরা তাদের নিজস্ব ভাষার অক্ষর জ্ঞানও জানে না। তবে শহর অঞ্চলে কিছুটা এ শিক্ষা গ্রহণের প্রচলন পরিলক্ষিত হয়। যা মারমাদের তাদের নিজস্ব ভাষা জ্ঞানে পিছিয়ে রেখেছে। যদিও নারী-পুরুষ সকল মারমাই তাদের নিজস্ব ভাষায় কথা বলে। তবে নিজস্ব ভাষা শিক্ষার ক্ষেত্রে মারমাদের এই অনীহা তাদের আগামী প্রজন্মের জন্য সমস্যা সৃষ্টি করবে বলে মারমাভাষী সুধী সমাজের অভিমত।

মারমা শিশুরা তাদের নিজস্ব ভাষা শিক্ষার প্রাথমিক মৌখিক পাঠ তাদের বাবা-মা'র কাছ থেকেই অর্জন করে। তবে লিখিত ভাষা শিক্ষার প্রাথমিক আনুষ্ঠানিকতা শুরু হয় বৌদ্ধ মন্দির বা কিয়াং এ এবং স্থানীয় টোল এ। কিন্তু বাংলাদেশের অধিবাসী হওয়ায় তাদের বাংলা ভাষাতেই আনুষ্ঠানিক শিক্ষা গ্রহণ করতে হচ্ছে। স্থানীয় প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে মারমা ভাষা শিক্ষার খুব একটা সুযোগ নেই। আর তা অনেকটাই মারমা ভাষী শিক্ষকের অভাবের কারণে। তবে ভাষার প্রতিবন্ধকতার কারণে অনেক মারমা শিশু ভয়ে বাংলা মাধ্যম স্কুলের পা মাড়ায় না। ফলে, তারা না পারছে মারমা ও না পারছে বাংলায় অক্ষর জ্ঞান অর্জন করতে। আর এ কারণে মারমাদের মধ্যে শিক্ষার হার তুলনামূলক কম। আজকাল অবশ্য অভিভাবকরা সচেতন হওয়ার কারণে এবং কালের প্রয়োজনে তাদের ছেলেমেয়েদের বাংলা মাধ্যমে পড়াশোনা করানোর জন্য স্কুলগুলোতে পাঠাতে বাধ্য হচ্ছে। ফলে, দিনদিন বাংলাভাষায় শিক্ষা গ্রহণে মারমা ছেলেমেয়েরা এগিয়ে আসছে। এটি ভালো লক্ষণ। অনেক ছেলেমেয়ে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা শেষে কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করছে। যদিও তাদের সংখ্যা খুবই কম। তাছাড়া শিক্ষা ক্ষেত্রে তাদের পিছিয়ে থাকার অন্যতম কারণ হলো দারিদ্র্য। দারিদ্র্য বিমোচন না হলে পিছিয়ে পড়া এই আদিবাসী

জনগোষ্ঠীর শিক্ষা ক্ষেত্রে অগ্রগামী হওয়াটা দুরূহ নিঃসন্দেহে। এছাড়া গভীর অরণ্য জনপদ ও প্রান্তিক অবস্থানের কারণে এবং নানা অবকাঠামোগত সমস্যা ও যোগাযোগ ব্যবস্থার প্রতিবন্ধকতার জন্য শিক্ষা ক্ষেত্রে মারমাদের এগিয়ে আসাটা কঠিন। এক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় ও স্থানীয় সরকারের ভূমিকা থাকা বিশেষভাবে দরকার। শিক্ষাক্ষেত্রে অনগ্রসরতা, অফিস আদালতে ব্যবহৃত ভাষা, নিয়ম-কানুন, রীতি-নীতি সম্পর্কে অজ্ঞতা মারমা জনজীবনকে প্রতিটি ক্ষেত্রে পশ্চাৎমুখী ও অনগ্রসর করে দিয়েছে। সরকার সব সময়েই সুবিধা বঞ্চিতের জন্য এগিয়ে আসে। মারমাদের ক্ষেত্রেও সরকার তার নানামুখী উন্নয়ন কার্যক্রমের মাধ্যমে এগিয়ে আসবেন এটিই কামনা করছে পার্বত্য চট্টগ্রামের অন্যান্য জাতিগোষ্ঠীর মতো সুবিধাবঞ্চিত মারমা জাতিগোষ্ঠীর অধিবাসীরা।

মারমাদের পরিবার, বিবাহ ও সম্পত্তির উত্তরাধিকার ঃ মারমারা রাখাইনদের মতোই কালের প্রবাহে সমাজের ক্রমবিকাশের ফলে আধুনিককালে এসে মাতৃতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা থেকে পিতৃতান্ত্রিক সমাজে রূপান্তরিত হয়েছে। চূড়ান্তভাবে মারমা সমাজ ব্যবস্থা পিতৃতান্ত্রিক। সম্পত্তির উত্তরাধিকারে ছেলে ও মেয়ের সমান অধিকারের কথা বলা আছে। তবে তা কতটা কার্যকর সে প্রশ্ন রয়ে গেছে। কার্যত মারমা সমাজে মেয়েরা কি তার বাবা বা মা'র সম্পত্তির সমান অধিকার ভোগ করতে পারেন? এই প্রশ্ন অনেক সচেতন মারমা নারীর। মারমা সমাজে বিয়ের পর নারী পুরুষ ইচ্ছে করলে মা-বাবার বাড়ি কিংবা শ্বশুর বাড়ি স্থায়ীভাবে বসবাস করতে পারে।

বিবাহ হচ্ছে মানব জীবনের অবিচ্ছেদ্য প্রয়োজনীয় সামাজিক ও জৈবিক প্রপঞ্চ। "বিব-াহ হচ্ছে সমাজ, সংস্কৃতি ও ধর্ম কর্তৃক অনুমোদিত এমন একটি সামাজিক চুক্তি যার মাধ্যমে একজন পুরুষ ও একজন মহিলা একত্রে বসবাস করার চূড়ান্ত ক্ষমতা অর্জন করে।"

বিশিষ্ট নৃবিজ্ঞানী ওয়েস্ট মার্ক এর মতে, বিবাহ এমনই একটি প্রতিষ্ঠান যার মাধ্যমে স্ত্রী ও পুরুষ মোটামুটি একটি স্থায়ী সম্পর্কে আবদ্ধ হয় এবং ছেলেমেয়ের জন্ম দেওয়ার পরও তাদের এ বন্ধন স্থায়ী থাকে।"[৬] "মারমাদের বৈবাহিক সম্পর্কটি চুক্তির উপর (On Contract) প্রতিষ্ঠিত নয়। প্রথাবদ্ধ রীতি-নীতি ও বিশ্বাসের উপর প্রতিষ্ঠিত। ফলে এই অবস্থার ও অন্যান্য ঘটনার কারণে বৈবাহিক সম্পর্ক ছিন্ন হতে দেখা গেছে। এতে সামাজিক শৃঙ্খলা নষ্ট হয়। এটি কাম্য নয়। যুগোপযোগী রীতি-নীতির প্রচলনের মাধ্যমে বিশ্বাসের উপর লিখিত বিবাহের নিয়ম করা উচিত।"[৭]

মারমা সমাজে বহু বিবাহের প্রচলন আছে। একজন পুরুষ স্ত্রীর মৃত্যুর পর বা স্ত্রীর জীবিত অবস্থায় একাধিক বিয়ে করতে পারে। অন্যদিকে একজন নারীও তার স্বামীকে পরিত্যাগ করে অন্য পুরুষ বিয়ে করতে পারে। তবে একসঙ্গে একাধিক পুরুষকে বিয়ে করার কোনো প্রচলন মারমা সমাজে নেই। তবে মারমা সমাজে পুরুষের এই একাধিক বিয়ে ব্যতিক্রমই বটে। অন্যদিকে ক্রস কাজিনে বিয়ের নিয়ম মারমা সমাজে সীমিতভাবে লক্ষণীয়। এক্ষেত্রে মা'র ভাইয়ের সন্তান বা পিতার বোনের সন্তানের সাথে বিয়ে মারমা সমাজে স্বীকৃত। কিন্তু চাচাতো ভাই বা বোন, খালাতো ভাই বা বোনদের (Parallel Cousin) মধ্যকার বিয়ে মারমা সমাজে অনুমোদন দেয় না। তাছাড়াও মারমা সমাজে দ্বিস্ত্রীত্ব (Soroate) বিয়েও পরিলক্ষিত। দ্বিস্ত্রীত্ব বিয়ে হলো এমন বিয়ে যাতে একজন পুরুষ

তার স্ত্রীর মৃত্যুর পর বা স্ত্রীর জীবদ্দশায় স্ত্রীর ছোট বোনদের মধ্য হতে একজন বা একাধিক স্ত্রী গ্রহণ করতে পারেন।

মারমা সমাজে নিজস্ব গোত্রে বিবাহকে উৎসাহিত করা হয়। অপরদিকে ভিন্ন গোত্রে বিবাহকে নিরুৎসাহিত করা হয়। তবে ভিন্ন গোত্রে যে বিয়ে হয় না এমন নয়। আজকাল আধুনিকতার পরশে মারমা ছেলেমেয়েদের বহির্গমন ও সামাজিক মেলামেশার সুযোগে একে অন্যকে জানা ও চেনার মধ্য দিয়ে প্রণয় ঘটিত কারণে ভিন্ন গোত্রে বিয়ে লক্ষণীয়। এছাড়াও ক্ষুদ্র জনগোষ্ঠী হিসেবে পাত্র-পাত্রীর স্বল্পতার কারণ ও সমন্বয় সাধনে ভিন্ন গোত্রে বিবাহ অভিভাবকরা আর অযৌক্তিক ও অমঙ্গল ভাবেন না। এছাড়া দেশের অভ্যন্তরে মারমা ও রাখাইনদের মধ্যে যেমন বিয়ে পরিলক্ষিত তেমনি দেশের বাইরে মায়ানমার ও ভারতে অবস্থানরত মারমা ও রাখাইনদের মাঝে বিয়ের ঘটনা ঘটছে। তাছাড়াও মারমা সমাজে নিজ বোনের সাথে শ্যালকের বা ভাইয়ের সাথে শ্যালিকার বিনিময় বিয়ে লক্ষণীয়। অন্যদিকে অভিভাকদের অমতে প্রেম করে পালিয়ে বিয়ে করার মতো ঘটনাও মারমাদের মধ্যে লক্ষ্য করা গেছে। পরে তা অভিভাবকদের পক্ষ থেকে গ্রহণ করা হয়েছে।

বিয়ের আনুষ্ঠানিকতা ঃ বাংলাদেশে মারমা জাতিগোষ্ঠীর বিয়েতে নানা আনন্দ-উৎসবের মধ্য দিয়ে ধুমধামের সাথে আকর্ষণীয়ভাবে বিয়ের অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়। প্রচলিত নিয়মে বিয়ের আগে বর পক্ষ ও কনে পক্ষের মধ্যে কথাবার্তা চলে। রাখাইনদের মতোই মারমাদের বিয়েতে প্রথমে বর পক্ষ থেকে বরের মা-বাবা, অন্যান্য মুরুব্বীবৃন্দ, ভাই-ভাবী, বন্ধু-বান্ধব থেকে বেজোড় সংখ্যক লোক এক বোতল মদ নিয়ে কনের বাড়িতে গিয়ে কনের মা-বাবাকে উপহার প্রদান করে এবং তারা সম্বন্ধ করতে সম্মত আছে কিনা তা জিজ্ঞেস করে। সম্মতি প্রদানের আগ্রহ থাকলে মেয়ের মতামত নেয়া হয়। অসম্মতি জ্ঞাপন করলে ঐ মদ ফেরত দেয়া হয়। আর সম্মতি জ্ঞাপন করলে অনুরূপ আর এক বোতল মদ কনের পরিবারের পক্ষ থেকে বর পক্ষকে উপহার প্রদান করা হয়। এবং দুই পক্ষের লোকজন তখন বর-কনের মঙ্গল কামনা করে আনন্দ ধ্বনির মধ্য দিয়ে ঐ মদ পান করে। অন্যদিকে জাতক-জাতিকার শুভ সময়, শুভ লগ্ন, দিনক্ষণ ইত্যাদি দেখার জন্য জ্যোতিষী বা গণক ডাকা হয়। তিনি জাতক-জাতিকার জন্মদিন জেনে বিচার-বিশে-ষণ করে বিয়ের শুভদিন ধার্য করে দেন। সাধারণত শনিবারে যাদের জন্ম তাদের সাথে মঙ্গল, বৃহস্পতি ও বুধবার, রবিবারের সাথে মঙ্গল ও শুক্রবারে, সোমবারের সাথে বৃহস্পতি ও শুক্রবার, মঙ্গলবারের সাথে বৃহস্পতি ও শুক্রবার, বুধবারের সাথে শনি, বৃহস্পতি ও সোমবার, বৃহস্পতিবারের সাথে মঙ্গল, বুধ, শনি ও সোম এবং শুক্রবারে যাদের জন্ম তাদের সাথে রবি, শনি ও মঙ্গলবারে যারা জন্মগ্রহণ করেছে তাদের সাথে বিয়েকে শুভদিন হিসেবে গণ্য করা হয়।

এভাবে কথা-বার্তা সম্পন্ন হলে বাগদান অনুষ্ঠানের আমন্ত্রণ জানানো হয়। কোনো কোনো ক্ষেত্রে ঐ দিনই বাগদান সম্পন্ন হয়। বাগদানের দিন পাত্রও মেয়ের বাড়িতে আসে। এদিন মেয়েকে আনুষ্ঠানিকভাবে আংটি পরানো হয় (Engagement ring)। এছাড়া এদিন পাত্র পক্ষ থেকে পাত্রীকে দেয় গয়না-গাটির পরিমাণ নির্ণয় করা হয়। রাখাইনদের মতো মারমাদের বিয়েতেও পণ প্রথা নেই। কিন্তু আলাপ-আলোচনার মধ্য দিয়ে মেয়েকে দেয় সোনা-দানার পরিমাণ অনেককাল থেকেই প্রচলিত হয়ে আছে।

মারমাদের বিয়েও রাখাইনদের মতোই মেয়ের বাড়িতে সম্পন্ন হয়। বিয়ের ক'দিন আগে থেকেই বর ও কনের বাড়িতে আত্মীয়-স্বজনের আগমন ঘটতে থাকে এবং এক আনন্দঘন পরিবেশ বিরাজ করে। ছেলেমেয়েরা নানা রকম মজাদার পিঠা তৈরি করে এবং নাচে-গানে হৈ-হুলে-াড়ে পুরো বাড়ির পরিবেশ আনন্দময় করে তোলে।

বিয়ের দিন বিয়ে বাড়ির (মেয়ের বাড়ি) প্রবেশ দ্বারে সজীব পাতাসহ দু'দিকে নানা রঙের কাগজে নক্শা কেটে কলাগাছ পোঁতা হয়। কলা গাছের সামনে দুটো কলসে কচি আম পাতা সাজিয়ে রাখা হয়। রাখাইনরা এক্ষেত্রে কলা গাছের পরিবর্তে নারকেল গাছের ডাল ও পাতা ব্যবহার করে। আর নানা বর্ণময় কাগজ দিয়ে বিয়ের মণ্ডপ সাজানো হয়। বিয়ে বাড়ি যাত্রার সময় পুরুষ-মহিলা মিলিয়ে বেজোড় সংখ্যক বরযাত্রী থাকে। সংখ্যা গণনার এই বেজোড় সংখ্যা মঙ্গলের প্রতীক বলে ধরে নেয়া হয়। সঙ্গে নেয় একটি সেদ্ধ মোরগ, এক মুঠো বাসি ভাত, পানি ও চালসহ বিভিন্ন বনজ সজির সমন্বয় মিশ্রিত 'মুলী' এক বোতল; একটি ক্রোঃদাই আংগ্যি– যা মহিলাদের উর্ধ্বাঙ্গের বিশেষ ধরনের পোশাক; ক্রোঃদাই আংগ্যি– অনেকটা ব্রা'র মতো এবং একটি গংপং– মাথার ওড়না বা পাগড়ি বিশেষ। এছাড়াও বিশেষ ধরনের গয়নার বাক্স থাকে। থাকে পোশাক পরিচ্ছদ। কনের বাড়ি পৌছানোর পর সঙ্গে আনা পোশাক-পরিচ্ছদ, অলঙ্কার ইত্যাদি দেখানো হয়। মেয়েরা এসব নিয়ে কনে সাজায়। এরই মধ্যে প্রীতিভোজ চলে। প্রীতিভোজের পর বর পক্ষের অবিবাহিত যুবতী মেয়েরা কনেকে দু'দিক থেকে ধরে ধীর গতিতে বিয়ের মণ্ডপে নিয়ে আসে। অন্য দিকে বরযাত্রী বিয়ের মণ্ডপে ঢোকার সময় কনে পক্ষের মেয়েরা আম্রপত্রে আচ্ছাদিত মঙ্গলঘটের পানি ছিটিয়ে বর পক্ষকে স্বাগতম জানায়। প্রচলিত নিয়ম অনুসারে বরকে ডান দিকে এবং কনেকে বাম দিকে বসানো হয়। এরপর আগত ভিক্ষুদের একজন শীল প্রদান ও মঙ্গলসূত্র পাঠ করে বর কনের কল্যাণ কামনা করে প্রার্থনা করেন। প্রার্থনায় নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলে অংশ গ্রহণ করে। প্রার্থনা শেষে বিয়ের মূল অনুষ্ঠান শুরু হয়। এই অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন এমন একজন যিনি ব্যক্তি জীবনে বিপত্নীক এবং স্ত্রী কর্তৃক তালাক প্রাপ্ত নন। যাকে মারমা ভাষায় 'মাদেছরা' বলা হয়ে থাকে। অর্থাৎ মাদেছরা এমন একজন ব্যক্তিত্ব যার স্ত্রীর মৃত্যু হয়নি এবং যিনি স্ত্রীকে তালাক দেননি। তিনি নানা লৌকিক আনুষ্ঠানিকতা দিয়ে বিয়ের কাজ সারেন। অন্যদিকে বিপত্নীক নয় এবং তালাকপ্রাপ্ত স্ত্রী বা স্ত্রী কর্তৃক তালাক প্রাপ্ত নয়, বরের এমন মা-বাবাই সচরাচর বর-কনের হাতে হাত মিলিয়ে থাকেন। তবে কোনো কারণে শর্ত পূরণ না হলে 'মাদেছরা' হাত মিলিয়ে দেন। এরপর আগত অতিথিবৃন্দ ধাতব দা বা ছেনীতে প্যাঁচানো সুতোর কুণ্ডলি থেকে সুতো বের করে বর কনেকে মনিবন্ধে বেঁধে আশীর্বাদ করে এবং যার যার সাধ্যমত সঙ্গে আনা উপহার ও নগদ অর্থ প্রদান করে। এরপর বর কনেকে খাওয়ানোর জন্য বরপক্ষ সঙ্গে যে খাদ্য সামগ্রী এনেছে বিশেষ করে সেদ্ধ মোরগ, মুলী ও মদ সবাই মিলেমিশে পান ও ভক্ষণ করে। তবে, এক্ষেত্রে 'মাদেছরা' সেদ্ধ মোরগকে খাবার উপযোগী করার জন্য নানা মসলা ও অন্যান্য উপকরণ মেশায়। তার মধ্যে সেক দেয়া আদা, ছুরি মাছ বা ফাইস্যা মাছ, ভাত, জুমের আলু ইত্যাদি অন্যতম। বর ও কনেকে বিশেষ একটি বড় থালায় খাওয়ানোর জন্য এসব আয়োজন করা হয়। মারমা ভাষায় এই অনুষ্ঠানকে 'লাক্ছাং চা-চ' বলে। এরপর বর কনে

খেতে বসে। প্রথমে বর কনেকে এবং পরে কনে বরকে খাইয়ে দেয়। এ সময় পাশে উপস্থিত সকলে খাবারের ভাগ নেয় এবং তাদের মধ্যে নানা হাসি-তামাশা ও ঠাট্টা-মশকরা চলে।

মারমাদের বাসর খুব মজার। হাতের মনিবন্ধে প্যাঁচানো সুতা সারারাত বরকনেকে রাখতে হয়। সে রাতে তাদের বাসর হয়। তবে পুরানো দিনের নিয়ম অনুসারে বিছানায় বর কনের মাঝখানে একটি লম্বা দা বা ছেনী রেখে তিন থেকে সাত দিন শয়ন করার নিয়ম প্রচলিত ছিল। এতে বর কনের একের প্রতি অন্যের সম্মানবোধ বৃদ্ধি পাবে বলে প্রাচীন লোকদের ধারণা ছিল। তবে আজকাল আর এসব খুব একটা রাখা হয় না।

বিয়ের পর দিন খুব ভোরবেলা বর-কনে মাদেছরার আগের দিনের বর-কনের জন্য তৈরি করা উচ্ছিষ্ট খাবার ও একটি কলস নিয়ে নদীর ঘাটে যায়। উচ্ছিষ্ট খাবার আনন্দের ভাগীদার জলজ প্রাণীর জন্য নদীতে ফেলে দেয় এবং কনে উজানমুখী পানি ভরে অনাগত ভবিষ্যতের মঙ্গল কামনায় কলসটি বরকে প্রদান করে। এভাবেই তিন থেকে সাতদিন মেয়ের বাড়ি থেকে কনেকে নিয়ে বরের বাড়ি ফিরে আসে বর।

গৃহায়ন, লোকাচার ও পোশাক-পরিচ্ছদ ঃ মারমারা সাধারণত নদী, ছড়া কিংবা হ্রদের পাড় ঘেঁষে, পাহাড়ের পাদদেশে যূথবদ্ধভাবে পাড়ায় মাচাং ঘর তৈরি করে বসবাস করে। অনেকগুলো গৃহস্থ মিলেমিশে এক একটি পাড়া গড়ে তোলে– যা সমষ্টিগতভাবে গড়ে উঠেছে। আর্থিক অবস্থা ভেদে কারও ঘর বাঁশের মাচাংয়ে মুলী বাঁশের বেড়ায় ও শনের ছাউনিতে গড়া আবার আর্থিক সচ্ছলতার জন্য কারও মাচাং টিনের বেড়া ও ছাউনিতে আচ্ছাদিত। প্রতিটি পাড়ায় রয়েছে পাতকুয়া। অবশ্য আজকাল কোথাও কোথাও টিউবওয়েলের বিশুদ্ধ পানি পাচ্ছে মারমারা।

মারমারা বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী হওয়ায় বৌদ্ধ তিথির নানা দিবস ও উৎসব-পার্বণ যথাযোগ্য মর্যাদা ও আনন্দঘন পরিবেশে পালন করে থাকে। বিশেষ করে বৈশাখী পূর্ণিমা বা বৌদ্ধ পূর্ণিমা, আষাঢ়ী পূর্ণিমা, আশ্বিনী পূর্ণিমা, মাঘী পূর্ণিমাসহ তারা ঘটা করে পুরাতন বর্ষ বিদায় ও নববর্ষ পালন করে। মারমা ভাষায় নববর্ষকে বলা হয় সাংগ্রেং। যা সাধারণত চৈত্র সংক্রান্তির দিন ও বাংলা নববর্ষের প্রথম দিন তারা আনন্দ-উৎসবের মধ্য দিয়ে উদযাপন করে। নববর্ষের দিন মহা ধুমধামের সাথে পানি খেলা বা জলকেলি উৎসব হয় যা খুবই বর্ণাঢ্য ও আকর্ষণীয়। এদিন মারমা ছেলেমেয়েরা পরস্পরের প্রতি পানি ছিটিয়ে পুরাতন বছরের সকল মলিনতা ও গ-ানি ধুয়ে মুছে ফেলে পুরাতন বর্ষকে বিদায় ও নববর্ষকে স্বাগত জানায়।

মারমাদের পোশাক পরিচ্ছদ বিশেষভাবে আকর্ষণীয়। বিশেষত মেয়েদের পোশাক। মারমা মেয়েরা বর্ণময় নক্‌শা আঁকা পোশাক পরতে পছন্দ করে। মেয়েরা সাধারণত নিচের দিকে লুঙ্গি (থাবিং) ও কোমর থেকে উপরের দিকে ব-াউজ (বেদাই এনজ্যি) ও বক্ষ বন্ধনী (বানজেই এনজ্যি) পরে। মারমা পুরুষরা লুঙ্গি ও ফতুয়া পরে। অন্যদিকে আজকাল আধুনিকতার ছোঁয়ায় মারমাদের মাঝে পুরুষরা কেউ কেউ নতুন যুগের প্যান্ট শার্ট পরছে আর মেয়েরা স্কুল কলেজে সালোয়ার কামিজ পরছে। মারমা পুরুষদের মাঝে আগে পাগড়ি (গৌং পৌং) পরার রেওয়াজ ছিল। এখন সাধারণত পালা-পার্বণ ও উৎসব ছাড়া পাগড়ি

পরতে দেখা যায় না। মারমা মেয়েদের সাজগোজ খুবই পছন্দ। বিশেষ করে নানা ডিজাইনের সোনা-রূপার অলংকার ও নানা ধরনের প্রসাধনী তারা ব্যবহার করে। তাছাড়া নানা রকমের চুল ও খোঁপা বাঁধা, বেনী করা ও খোঁপায় নানা জাতের ফুল গুঁজতে পছন্দ করে।

মারমাদের প্রধান খাদ্য ভাত। মারমারা ভাত-মাছ, শাক-সবজি, শুঁটকি মাছ, পোষা ও বন্য শূকর, হরিণ, ছাগল, মুরগী, কবুতর, হাঁস-মুরগীর মাংস, কচ্ছপ, কাঁকড়া, ব্যাঙ, শামুক, ঝিনুক খেতে পছন্দ করে। মারমারা চাষাবাদের পাশাপাশি বনজ তরি-তরকারি যেমন বাঁশ কোড়ল, বুনো ওল, ব্যাঙের ছাতা বা মাশরুম ইত্যাদি খেয়ে থাকে। মারমাদের অন্যতম খুবই প্রিয় খাদ্য হচ্ছে নাপ্পি বা সিঁদোল। যা শুঁটকি মাছের গুড়ো থেকে হয়ে থাকে। সকল তরকারিতে তারা এটি দিয়ে খেতে পছন্দ করে। আর তাদের পছন্দের তালিকায় রয়েছে টক। অপরদিকে বিন্নী ধানের নানা পদের পিঠে পায়েসও মারমাদের প্রিয়। উৎসব-পার্বণে মারমা তরুণ-তরুণীরা দল বেধে রাত জেগে পিঠে তৈরি করে।

মারমা পুরুষ ও মহিলাদের মাঝে ধুমপান লক্ষণীয়। বিশেষ করে তাদের চুরুট ও পাইপ টানতে দেখা যায়। এছাড়াও সকল মারমা নারী-পুরুষ নির্বিশেষে বালক-বালিকা, যুবক-যুবতী, আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সকলেই পানির মতো দুধ চিনি ছাড়া কিছুক্ষণ পরপর গরম চা পান করে।

ধর্ম ঃ মারমারা প্রাচীনকাল থেকেই মহামতি গৌতম বৌদ্ধের অনুসারী। বাংলাদেশে মারমারা শতকরা একশ' ভাগ বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী। বৌদ্ধ ধর্মের প্রাচীন দুই ধারায় যথা 'মহ-যান' ও 'হীনযান' এর মধ্যে মারমারা 'হীনযান' এর থরোবাদী তথা পালি ত্রিপিটকে বর্ণিত বৌদ্ধমতের অনুসারী। "মারমা সমাজে ধর্মগুরু ভিক্ষুরাও দুইভাগে বিভক্ত। যেমন– মাংগই এবং সাংঘাতাইং অর্থাৎ রাজগুরু পুরোহিত সংঘ এবং প্রজাগুরু পুরোহিত সংঘ। ধর্মীয় জীবনে বৌদ্ধ মারমা পুরোহিতদের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।"[৯] এরা সমাজে বৌদ্ধ ভিক্ষুদের অত্যন্ত সম্মান ও মর্যাদার আসনে স্থান দেয়। ভিক্ষুদের প্রতি মারমা নারী-পুরুষ আবাল-বৃদ্ধ সকলের রয়েছে অশেষ শ্রদ্ধা, গভীর মমতা ও নিরবচ্ছিন্ন ভালোবাসা। বৌদ্ধ মন্দিরে অবস্থানরত ভিক্ষুদের প্রতিদিনের খাবার নির্বিশেষে সাধ্যমত সকল গৃহস্থ ভাগ করে পরিবেশন করে। মারমারা বৌদ্ধমতের পবিত্র দিনগুলো যথাযোগ্য মর্যাদার সাথে পালন করে। বৈশাখী বা বৌদ্ধের জন্ম ও মৃত্যু দিন উপলক্ষে বৌদ্ধ পূর্ণিমা, আষাঢ়ী পূর্ণিমা, ভাদ্র পূর্ণিমা, কার্তিকী পূর্ণিমা উলে-খযোগ্য। মহামতি বৌদ্ধের জন্ম , নির্বাণ লাভ ও মৃত্যু দিন একই হওয়ায় তারা ঘটা করে আনন্দ-উৎসবের সাথে বৈশাখী পূর্ণিমা পালন করে। এছাড়াও শ্রমণ উৎসব ও কঠিন চীবর পালন করে। মারমাদের সবচেয়ে পবিত্র স্থান হচ্ছে তাদের ধর্ম মন্দির। এখানে তারা পুতঃ পবিত্রতার সাথে খালি পায়ে বিনয়াবনত হয়ে প্রবেশ করে বৌদ্ধ মূর্তির পাদমূলে শ্রদ্ধা নিবেদন করে। কেউ কেউ শান্তি ও স্বর্গলাভের আশায় নিজেকে নিবেদন করে। এরা আজীবন অবিবাহিত থেকে গৈরিক বস্ত্র পরিধান করে ভিক্ষুত্ব গ্রহণ করে ত্যাগের মহিমায় নিজেকে উৎসর্গ করে।

যদিও মারমারা বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী তথাপি আদিম আদিবাসী অনক্ষর সমাজের নানা রকম বিচিত্র ধরনের কুসংস্কার, আচার-অনুষ্ঠান ও পূজা-অর্চনা ধর্মের নামে পালন করে। যদিও

বৌদ্ধ ধর্মের বিজ্ঞান-বিশে-ষণ এসব নিয়মাচারের বিরোধী। তথাপি মারমাদের মাঝে আদিবাসী সমাজের ধর্মের নামে আত্মা-প্রেত্মাতায় বিশ্বাস, প্রকৃতি পূজা, অতি প্রাকৃত শক্তি ও অতি মানবে বিশ্বাস লক্ষণীয়। তাই দেখা যায়, এদের মধ্যেও রয়েছে বিশেষ বস্তুতে ভক্তি, স্বপ্ন ও নৈর্ব্যক্তিক শক্তিতে বিশ্বাস, মায়াবাদের প্রতি আসক্তি, ভক্তি ও অনুরাগ ইত্যাদি।

বৌদ্ধ ধর্মের শাস্ত্রীয় নিয়মাচারের বাইরেও মারমারা নানা পৌরাণিক রীতি-নীতি ও দেব-দেবীতে বিশ্বাসী। যা অনেক ক্ষেত্রে আদিম প্রকৃতি পূজা। এ কারণে তারা বিভিন্ন দেব-দেবীর পূজা-অর্চনা করে থাকে। যেগুলোর সঙ্গে বাঙালি হিন্দুর প্রকৃতি প্রজারীদের অনেকাংশে মিল পাওয়া যায়। তবে তা ভিন্ন ভিন্ন মারমাভাষী নামে পরিচিত। মারমাদের নানা লোকাচার, পৌরাণিক কাহিনী, সঙ্গীত, নৃত্য ও নাটকে এসব প্রতিফলিত হয়।

অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া ঃ মানুষের জন্মের পরে মৃত্যু অবধারিত। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জীব মানুষ। সকল ধর্মেরই এমনকি আদিবাসী জীবনেরও মৃত্যু পরবর্তী শিষ্টাচার লক্ষণীয়। মুসলিম, খ্রিষ্টান ও ইহুদি ধর্মাবলম্বীরা মৃত্যু পরবর্তী কবর দেয়। হিন্দুরা মরদেহ দাহ করে সৎকার করে। অপরদিকে বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীরা মৃত্যু দেহ কবর দেয়া এবং দাহ দুটোই করে থাকে। তবে সাধারণত ধনাঢ্য বা সম্মানীয় পুরুষ মহিলা কিংবা বৌদ্ধ ভিক্ষু বা ভিক্ষু সংঘের প্রধান বিহারাধ্যক্ষ প্রয়াত হলে মৃত্যু দেহ দাহ করা হয়। বিশেষ করে ধর্মগুরু ভিক্ষু বা বিহারাধ্যক্ষর প্রয়াণ হলে মৃত্যু দেহ কোনো কোনো ক্ষেত্রে ছয় মাস থেকে এক বছর বিশেষ প্রক্রিয়ায় মমির ন্যায় করে রাখা হয়। তারপর বর্ণাঢ্য ভাবগম্ভীর অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া পালন করে দেহ দাহ করা হয়। মারমাদের মৃত্যু পরবর্তী সৎকারে নানা লোকজ ও ধর্মীয় শিষ্টাচার পালন করা হয়। শিশুদের মৃত্যুর ক্ষেত্রে এ সকল শিষ্টাচার সংক্ষিপ্ত হয়। অন্যদিকে অবিবাহিত, কিন্তু বিবাহযোগ্য কোনো তরুণ-তরুণী মারা গেলে কবর দেয়ার সময় লাশের সঙ্গে কাঠের গুঁড়ি বা কলাগাছের গুঁড়ি পাশে শুইয়ে দেয়া হয়। যেহেতু এই পৃথিবীতে তাঁর জন্ম হলেও তিনি দুর্ভাগ্যক্রমে কোনো জীবনসঙ্গী পাননি অর্থাৎ কোনো পারিবারিক বন্ধনে আবদ্ধ হননি সে কারণ পরজন্মে যেন তাঁর আর এই ঘটনা না ঘটে এই বিশ্বাসবোধ থেকে মারমা অবিবাহিত তরুণ-তরুণীদের মাঝে লাশের সঙ্গে গাছ ও কলাগাছের গুঁড়ি শুইয়ে দেওয়ার রেওয়াজ চালু রয়েছে। অবশ্য দীর্ঘায়ু প্রাপ্ত অবিবাহিত নর-নারীর ক্ষেত্রেও এই নিয়ম প্রচলিত।

লাশ কবর দেয়া বা দাহ করার পর ধর্মীয় নিয়ম মতে নানা শিষ্টাচার পালন শেষে বৌদ্ধ ভিক্ষুদের পরিচালনায় শ্রাদ্ধ সম্পন্ন করতে হয়। শ্রাদ্ধে নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলে অংশ গ্রহণ করে। পারিবারিক অবস্থা ও সঙ্গতির প্রেক্ষিতে কি পরিমাণ লোক খাওয়ানো হবে তা নির্ণীত হয়।

অন্ত্যলেখ ঃ পার্বত্য চট্টগ্রামের মঙ্গোলীয় নৃগোষ্ঠীর মারমা জাতিগোষ্ঠীর জীবনাচার তথা তাদের আচার-আচরণ, গৃহায়ন ও লোকাচার, ধর্ম ও ভাষা, শিক্ষা, মূল্যবোধ ও মনোবৃত্তি, পোশাক, খাদ্যাভাস, বিবাহ, পরিবার ও উত্তরাধিকার প্রথা, সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য বাংলাদেশের অন্যান্য জাতিগোষ্ঠী থেকে ভিন্নতর নিঃসন্দেহে। যা বর্ণাঢ্য ঐতিহ্যের অধিকারী এবং যা অন্যান্য জাতিগোষ্ঠীকে আকর্ষণ করে।

তথ্যসূত্র

১. প্রভাতাংশ মাইতি, *ভারত ইতিহাস পরিক্রমা* (প্রাচীন যুগ), কলিকাতা, পৃ. ৪৮৫-৪৮৬, সংকলিত : মং ক্য শোয়ে নু নেভী, 'মারমা সমাজ ও সংস্কৃতি ঃ অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যত', *সাংগু*, বর্ষ-৬, সংখ্যা-১, উপজাতীয় সাংস্কৃতিক একাডেমী, বান্দরবান, এপ্রিল, ১৯৮৮ এবং মুস্তাফা মজিদ, সম্পাদিত, *মারমা জাতিসত্তা*, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, ২০০৪, পৃ. ৪৮
২. মং ক্য শোয়ে যু নেভী, *ঐ*, পৃ. ৪৮
৩. উচনু, 'বান্দরবান পার্বত্য জেলা ঃ উপজাতীয় নৃগোষ্ঠী, মারমা', মুস্তাফা মজিদ, সম্পাদিত, *ঐ*, পৃ. ৩৫-৩৬ এবং মং ক্য শোয়ে নেভী, *ঐ*, পৃ. ৫১
৪. মং ক্য শোয়ে নেভী, *ঐ*, পৃ. ৫১
৫. মং ক্য শোয়ে নেভী, *ঐ*, পৃ. ৫৮
৬. উ থোয়াই চিং উনু, 'মারমা সমাজে বিয়ে', মুস্তাফা মজিদ, সম্পাদিত, মারমা জাতিসত্তা, *ঐ*, পৃ. ১০৪
৭. চাই সুই হ্লা, 'মারমা সমাজ ও সংস্কৃতি ঃ অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যত', মুস্তাফা মজিদ, সম্পাদিত, *ঐ*, পৃ. ৬৫
৮. উ থোয়াই চিং উনু, *ঐ*, পৃ. ১০৪-১১০
৯. উচনু, *ঐ*, পৃ. ৩৬

লেখক কবি ও গবেষক এবং মহাব্যবস্থাপক, বাংলাদেশ ব্যাংক, ঢাকা।

পার্বত্য চট্টগ্রামে

'বিজু' নামে উৎসব পালনের নির্দেশনা !

অছ্য কুমার তঞ্চঙ্গ্যা

গত ২৭ মার্চ, ২০০৮ দৈনিক *প্রথম আলো*'র ২য় পৃষ্ঠায় 'বিজু নামে উৎসব পালনের নির্দেশনা, খাগড়াছড়িতে আদিবাসীদের অসন্তোষ' শিরোনামে একটি খবর ছাপা হয়। বিষয়টি নিয়ে ইতোমধ্যে সচেতন মহলে বেশ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়েছে, যা পত্রিকায় উল্লেখ করা হয়েছে। বিষয়টি জ্ঞাত হয়ে পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসী যারা চাকমা নন এবং প্রগতিশীল সচেতন চাকমা সমাজও মর্মাহত হয়েছেন এতে কোনো সন্দেহ নেই। বিষয়টি শুধু ঐ পত্রিকায় নয় দেশের অন্যান্য জাতীয় দৈনিকেও স্থান পেয়েছে।

উল্লেখ্য যে, বাংলাদেশের পার্বত্য চট্টগ্রামের নিজস্ব সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্য নিয়ে যথাক্রমে ১৪টি জাতিসত্তা চাকমা, মারমা, তঞ্চঙ্গ্যা, ত্রিপুরা, বম, খিয়াং, লুসাই, পাংখো, ম্রো, খুমি, গোর্খা, আসাম, চাক্‌, রাখাইন আদিবাসী জনগোষ্ঠীর বসবাস। তাদের নিজস্ব ভাষা, সংস্কৃতি, ইতিহাস, ঐতিহ্য, স্ব-অবস্থানকে বৈচিত্র্যময় করে তুলেছে। বাংলা নববর্ষ এবং এর পূর্বের দু'দিন অর্থাৎ বছরের শেষ দু'দিন মোট তিনদিন, ১৯৯২ সাল থেকে এরা 'বৈসাবি' নামে পালন করে আসছে।

বিশেষ করে ত্রিপুরা জনগোষ্ঠী বৈসু, মারমারা সাংগ্রাই, তঞ্চঙ্গ্যারা বিষু, চাকমারা বিজু এবং আসাম জনগোষ্ঠী অহমিয়া ভাষায় বিহু নামে পালন করে আসছে। নিঃসন্দেহে বলা চলে, এটি পার্বত্য চট্টগ্রামের বৃহৎ সামাজিক উৎসব। কারণ, এটি শুধু উল্লেখিত জনগোষ্ঠীরা পালন করে না বরং তাদের পাশাপাশি অন্যান্য জনগোষ্ঠীরাও (বাঙালিসহ) বেশ আনন্দের সাথে পারস্পারিক সহমর্মিতা এবং আপ্যায়নের মাধ্যমে মিলেমিশে পালন করে আসছে। বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর নিজস্ব নাম থাকলেও এটি 'বৈসাবি' নামে বেশ আলোচিত এবং এটিই প্রাসঙ্গিক। কারণ বৈ. সা. বি– অক্ষরগুলোর মাধ্যমে সবগুলোর নাম সন্নিবেশিত হয়েছে। বৈসাবি শব্দটির মধ্য দিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রামে আদিবাসী জনগোষ্ঠীর মধ্যে একটি ঐক্যর পূর্বাভাসও পাওয়া যায়। কিন্তু এ বছর ৯ই মার্চ, ২০০৮ পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের নির্বাহী কর্মকর্তা মিঃ কৃষ্ণ চন্দ্র চাকমা কর্তৃক স্বাক্ষরিত এক সরকারি পরিপত্রে 'বৈসাবি' এর পরিবর্তে শুধু 'বিজু' নামে নববর্ষ পালন করার নির্দেশনা দেওয়া হয়।

বিষয়টি জেনে আমরা যারা পার্বত্য চট্টগ্রামের ঐক্যতা অনুভব করি তারা অত্যন্ত মর্মাহত হয়েছি। কারণ 'বিজু' শব্দটি শুধু চাকমারা ব্যবহার করে থাকেন। আর অন্য দিকে বৈসাবি শব্দটিতে চাকমাসহ অন্যান্য জনগোষ্ঠীর নিজস্ব শব্দগুলো নিহিত রয়েছে। পার্বত্য চট্টগ্রাম

আঞ্চলিক পরিষদ (যার চেয়ারম্যান– মিঃ জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা বা সন্তু লারমা) এই গর্হিত কাজটি করে রীতিমত এর নিরপেক্ষতা নিয়ে এখন প্রশ্ন বিদ্ধ হয়েছে। স্পষ্টত, এ বিজু শব্দটি প্রচলনের নির্দেশনা দিয়ে অন্যান্য জনগোষ্ঠীর এই বৃহৎ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানকে হেয় বা ছোট করা হয়েছে তাতে কোন সন্দেহ নেই। আবার তা যদি পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের মাধ্যমে করা হয়ে থাকে তাহলে সেটি যে কতখানি সাম্প্রদায়িকতার পরিচয় দেয় তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। যা খুবই ঘৃণ্য এবং জঘণ্য। কারণ, এ প্রতিষ্ঠানের দায়িত্ব ও কর্তব্য হচ্ছে পার্বত্য চট্টগ্রামের সমন্বয় সাধন এবং উন্নয়ন তরান্বিত করা। বরং তারা এটি না করে তাদের পক্ষে ইচ্ছামত যুক্তিও দাঁড় করিয়েছে।

তাদের যুক্তি ছিল এক, বাংলাদেশ সরকারের স্পেশাল অ্যাফেয়ার্স বিভাগের '১৯৯৩ সালের অ্যাক্ট অনুযায়ী পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকায় উপজাতিদের জাতীয় সামাজিক উৎসব বিজু উপলক্ষে প্রতি বছর ৩০ চৈত্র দিবসকে পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে স্থানীয় ছুটি হিসাবে ঘোষণা করা হয়েছে' এটি উল্লেখ থাকায় এবং দুই, বৈসাবি নামে শব্দ কোনো উপজাতীয় ভাষায় নেই।

আমাদের সাধারণ মানুষের প্রশ্ন, বিজু শব্দটি হচ্ছে শুধু চাকমাদের, তাহলে পার্বত্য চট্টগ্রাম কি শুধু চাকমারা বসবাস করে? উক্ত উৎসবটি কি শুধু চাকমারা পালন করে আসছে? আঞ্চলিক পরিষদ কি শুধু চাকমাদের নিয়ে, নাকি শুধু চাকমাদের জন্য? আমি কোনো নির্দিষ্ট জাতিগোষ্ঠীর বিরোধীতা করছি না। কথা হচ্ছে যদি সরকারি নথিপত্রে বিজু শব্দটি থেকে থাকে তবে এটি সংশোধনের দায়িত্ব কি আঞ্চলিক পরিষদের উপর বর্তায় না? আর অন্যদিকে বৈসাবি শব্দটি কি ভাড়া করা শব্দ? অথবা রাষ্ট্র কি জোর করে এটি চাপিয়ে দিয়েছে? বিজু শব্দটি যদি আঞ্চলিক পরিষদ ব্যবহার করতে পারে তবে অন্য শব্দগুলো যেমন– সাংগ্রাই, বিষু, বৈসু , বিহু শব্দগুলো কেন ব্যবহার করতে পারে না ? সেগুলোর দোষ কি?

বিজু উপজাতি শব্দ হতে পারে কিন্তু বৈসাবি অউপজাতি বা অনাদিবাসী শব্দ নয়। আদিবাসীরা তাদের সাংস্কৃতিক বন্ধনের প্রয়োজনে এই শব্দটি ব্যবহার করে আসছে এবং করতে পছন্দ করে। আর পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ পূর্ব বছরের বৈসাবি নামে বিভিন্ন সংকলনের বিজ্ঞাপনও দিয়ে আসছিল। তাদের হঠাৎ এই সিদ্ধান্তের পেছনে আমরা জানি না কোন্ অশুভ উদ্দেশ্য কাজ করছে।

পরিশেষে বলতে চাই পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ পাহাড়ি আদিবাসীদের একটি বিশাল অর্জন। এটি পার্বত্য অঞ্চলে সকল জনগোষ্ঠীর একটি প্রতিনিধিত্বকারী প্রতিষ্ঠান। এখন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিতরা যদি শুধু একটি জনগোষ্ঠীর 'বিজু' শব্দটিকে নিজেদের পছন্দ মতো প্রচার করতে চায় বা বিশেষ একটি জনগোষ্ঠীর জন্য শুধু কাজ করে তবে এটি হবে সংখ্যালঘু দ্বারা সংখ্যালঘুদের বঞ্চনা ও নির্যাতনের হীন প্রয়াস। যা পার্বত্যবাসীর কারো কাম্য নয়।

লেখক ঃ ছাত্র, নৃবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

স্মরণীয় ঘটনা ঃ বিদ্যালয়ের শিক্ষা সফর

আনন্দের মধ্যে দুঃখের ছোঁয়া

লুক্ষি পুরি তঞ্চঙ্গ্যা

দিনটি ছিল ১০ই মার্চ, ২০০৮ রোজ সোমবার। অন্যান্য দিনের চেয়ে এই দিনটি আমার কাছে শুরু হয়েছিল আনন্দে। কিন্তু শেষ হয়েছিল দুঃখে। এই দিনে খুব ভোরে ঘুম থেকে উঠে খাওয়া দাওয়া শেষ করে তৈরি হলাম শিক্ষা সফরে যাওয়ার জন্য। গন্তব্য রাঙ্গামাটি হতে পতেঙ্গা সমুদ্র সৈকত। সেখানে যাওয়ার জন্য দু'টি বাস ভাড়া করা হয়েছে। বাসগুলো ছিল আমাদের স্কুলের সামনে। আমি ও আমার এক দাদাসহ যথাস্থানে উপস্থিত হলাম। সেখানে পৌছতে প্রায় সাতটা বেজে গেছে। গিয়ে দেখি আমার বন্ধু বান্ধবীরা সবাই এসে গেছে। যার যার কাজ নিয়ে সবাই ব্যস্ত। শিক্ষকরা সব কিছু ঠিক ঠাক করে নিচ্ছেন। দিনটিকে মাতিয়ে তোলার জন্য দুটো বাসে মাইক দেয়া হলো। এগুলো ছাত্ররা সব ঠিকঠাক করে নিচ্ছে। কিছুদূরে তাকিয়ে দেখি ছাত্র-ছাত্রীরা ভিড় হয়েছে একটি স্থানে। কৌতুহল হয়ে থাকতে না পেরে ছুটে গেলাম সেখানে। দেখি শিক্ষকরা সেখানে বাসে সিটের জন্য টিকেট দিচ্ছেন। কালবিলম্ব না করে আমিও নিয়ে নিলাম একটি টিকেট। আমার বাসে বসার স্থান হলো এইচ-২। বাসে উঠলাম। সিট খুঁজে বসে পড়লাম। জিনিসপত্র বসার সিটে রেখে এক বান্ধবীর সাথে দোকানে গেলাম আচার কেনার জন্য। টাকা দিতে ব্যাগ খুলতেই কি আশ্চর্য্য টাকাগুলো নেই! ভাবলাম টাকাগুলো গেলো কোথায়। টাকা না পেয়ে দোকানদারকে বললাম এগুলো এখন নেব না। এই বলাতে তিনি রাগ করে আচারগুলো নির্দিষ্ট স্থানে রেখে দিলেন। আমি বুঝতে পারলাম আচারগুলো না নেয়াতে তিনি রাগ করেছেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও আমার কিছুই করার ছিল না। আমি নিরুপায়। লজ্জায় বলতেও পারছিনা টাকা নাই। তারপর বান্ধবী বলল চল টাকা বাসে রেখে এসেছ কিনা দেখি। গাড়িতে খুঁজতে লাগলাম। তখনও আমরা রাঙামাটিতে ছিলাম। খুঁজতে খুঁজতে মনে পড়ে গেল বাড়ির কথা। ভাবলাম বাড়িতে রেখে আসিনিতো! ফিরে এসে দাদাকে সব বললাম। তিনি শুনে এক সেকেন্ডও দেরি না করে বাড়িতে চলে গেলেন টাকা খোঁজার জন্য। আমি বসে আছি। ভবছি টাকাগুলো কোথায় রাখলাম। নাকি হারিয়ে ফেললাম। ভাবলাম যাওয়া বুঝি আর হলো না। পতেঙ্গা দেখাও বুঝি আর হলো না। ভাবনার শেষ না হতে হতেই দাদা এসে হাজির। তার মুখের দিকে তাকিয়ে দেখি ঘেমে একাকার হয়ে গেছেন। তখনো ভাবলাম সত্যি সত্যি আমার পতেঙ্গা যাওয়া হচ্ছে না। এই কথা ভাবতে ভাবতে নিজেকে হারিয়ে ফেললাম। কিন্তু আমার সেই ভাবনা মূল্যহীন করে দাদা আমার হাতে টাকা গুলো তুলে দিলেন। তখন হতবাক হয়ে

দাদার দিকে তাকিয়ে রইলাম। টাকাগুলো সাবধানে রাখার জন্য দাদা আমাকে বললে আমি মাথা নাড়িয়ে হ্যাঁ সুচক জবাব দিলাম। একবারও ভাবলামনা যে ঠিকমতো রাখতে পারবো কিনা। আমার সাথীরা সবাই গাড়িতে উঠে গেছে। আমিও উঠে পড়লাম। কালবিলম্ব না করে গাড়ির সিটে বসে পড়লাম। আমাকে বসা দেখে একজন স্যার এসে আমাকে প্রশ্ন করলেন, আমার টিকেটের সিট নাম্বার আর বসার সিট নাম্বার এক কিনা। আমি বললাম, হ্যাঁ স্যার। স্যার চলে গেলেন। স্যার চলে যাওয়ার পর ভাবলাম স্যার একথা কেন জিজ্ঞাস করলেন। কিছু সন্দেহ হলো। তবুও অলসতার কারণে মিলিয়ে দেখলাম না নাম্বারটি। ভাবা শেষ হতে না হতে ঐ স্যার আবার আমার সামনে এসে বললেন, লুক্সি আসলে কি তোমার টিকেটের নাম্বার আর যেখানে বসছ সেটা একই নাম্বার? তখন ভাবলাম কিরে স্যার বারবার কেন এই কথা জিজ্ঞেস করছে? ওনিতো জ্ঞানী মানুষ, যদি সিটটা তাঁর না হয় তাহলে বারবার কেন জিজ্ঞস করবেন। তারপর যাচাই করার জন্য টিকেটের নাম্বার ও বসে থাকা সিটের নাম্বার মিলিয়ে নিলাম। দেখেতো আমি হতবাক। লজ্জায় তখন কিছু না বলে জিনিসপত্র হাতে নিয়ে খুঁজতে লাগলাম আমার সিট।

অবশেষে পেয়ে গেলাম। সেখানে এক বান্ধবী বসে আছে তাই দেরি না করে আমিও বসে পড়লাম। একসময় বাস পতেঙ্গার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলো। যাত্রা আনন্দদায়ক করার জন্য সবাইকে গান গাইতে হল। আমিও অবশ্য বাদ পড়িনি। আমি গাইলাম একটি পাহাড়ী গান। "ও-ও-ও- বয়ারাল।" গান গাওয়া শেষ হলে সবাইকে সকালের নাস্তা দেয়া হল। সময়ের সাথে সাথে পাল-া দিয়ে বাসও চলছে তার উদ্দেশ্যে। যেখানে যাওয়ার জন্য আমাদের এত আয়োজন। চলতে চলতে এক সময় চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে এসে বাস থামলো। সেখানে নেমে অনেক আনন্দ করলাম, ছবি তুললাম। আবার বাসে উঠে পড়লাম। বাস আবার চলতে লাগলো পতেঙ্গার উদ্দেশ্যে।

মনটা ছটফট করছিল সেখানে কখন পৌছবো এই ভেবে। কখন পতেঙ্গার বিশাল জলরাশির সাথে আমার পা দুখানা খেলা করবে। ভাবতে ভাবতে এক সময় দু'চোখে ঘুম এসে গেল। সেই ঘুম নিয়ে গেল স্বপ্নরাজ্যে। তারপর চোখ খুলে দেখি আমরা পতেঙ্গা পৌছে গেছি। গাড়ি থেকে নেমে শিক্ষকরা সতর্ক করে দিলেন যার যার টাকা পয়সা সাবধানে রাখতে। কারণ এখানে চোরের সংখ্যা বেশি। এই কথা শুনে আমার অন্তরে ভয় ঢুকে গেল। তবুও মনকে শক্ত করে শিক্ষকদের সাথে পথ চলতে লাগলাম। যেতে যেতে হঠাৎ ধপাস একটা আছাড় খাই। আমার পা কেটে খানিকটা রক্ত বের হতে লাগল। তখন ভাবলাম আমার এরকম হচ্ছে কেন? তাছাড়া রাঙামাটি থেকে এখানে আসার সময় টাকাগুলো হারিয়ে যেতে লাগল কেনো? তবেকি এখানে আমার আসা ঠিক হয়নি? আমার বান্ধবীরা বলল পা উচুঁ করে দাড়িয়ে কি ভাবছো? যাকে দেখবো বলে এখানে এসেছি তাকে দেখবো না? একথা শুনে আমার পেছনের ভাবা কথাগুলো অতি তুচ্ছ মনে হল। চলতে চলতে এসে পড়লাম সেই পতেঙ্গা সমুদ্র সৈকতে।

সেখানে অনেক লোকের সমাবেশ। বিশেষ করে ঝিনুকের দোকানগুলোতে। পঞ্চাশ টাকা দিয়ে একটা হাতের ব্রেসলেট নিয়ে নিলাম। টাকা দেয়ার সময় একটা লোক খুব গভীরভাবে আমার দিকে দৃষ্টি রাখল। আমি অবশ্য তা খেয়াল করিনি। আমার বান্ধবী থেকে

শুনেছি। মুহূর্তের মধ্যে মনে পড়লো শিক্ষকদের কথা। তাঁরা টাকা পয়সা সাবধানে রাখার উপদেশ দিয়েছিলেন। তাই আর সময় নষ্ট না করে টাকাগুলো কাঁধে ঝুলানো ব্যাগের মধ্যে মানিব্যাগটাসহ ঢুকিয়ে নিলাম। তারপর এক স্থান থেকে অন্য স্থানে, এক দোকান থেকে অন্য দোকানে যাওয়ার সময় সেই লোকটার সাথে ধাক্কা লাগে। আমি লোকটাকে ভালোভাবে খেয়াল করতে পারলাম না। একটু পরে সে অদৃশ্য হয়ে গেল। কিছুদুরে গিয়ে দেখি আমার মানি ব্যাগটা নেই। অচেনা একটি গাংচিল এসে আমার টাকাগুলো ছোঁ মেরে নিয়ে গেছে। তখন আর কি করবো। ভেবে না পেয়ে চুপ করে গাড়িতে উঠে বসলাম।

সবাই আনন্দ করলো মজা করলো, কিন্তু আমি ছিলাম মনমরা। কোথায় আনন্দ করবো তা না করে গোমড়া মুখ নিয়ে বসে রইলাম। সন্ধ্যা ঘনিয়ে এলে সবাইকে বাসে ওঠার জন্য বলা হলো। বাস রাঙামাটির উদ্দেশ্যে রওয়ানা দিল। আনন্দ হৈ চৈ না করে এক বুক জ্বালা নিয়ে ফিরতে হলো নিজের গন্তব্য স্থানে। দিন চলে যায় মাস চলে যায় কিন্তু মন থেকে সে স্মৃতি আজও মুছে ফেলতে পারিনি। খানিক আনন্দের মধ্যে দুঃখে ভরা ছিল সেই দিনটি। সেই দুঃখে ভারাক্রান্ত দিনটি আজও অম্-ান হয়ে আছে স্মৃতির মণিকোঠায়। তাই বলবো– চলার পথে সাবধান আনন্দ যেন বেদনার না হয়।

শিক্ষার্থী, তক্তানালা উত্তর পাড়া, বিলাইছড়ি, রাঙামাটি পার্বত্য জেলা।

রাইনস্যাং নদীর তীর ঘেঁষে ফারুয়া আদিবাসীদের জীবন চিত্র

সিদ্ধার্থ তঞ্চঙ্গ্যা (দত্ত)

বিলাইছড়ি উপজেলা থেকে প্রায় ৪০ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত ফারুয়া ইউনিয়ন। এ ইউনিয়নের বুক চিরে কলকল শব্দে বয়ে চলেছে ছোট্ট একটি নদী, যার নাম রাইনস্যাং নদী। স্থানীয় আদিবাসীরা একে রাইনস্যাংগাঙ নামে সম্বোধন করে থাকে। এ নদীর উৎপত্তিস্থল কোথায় এবং এর নামকরণ কিভাবে হলো তা জানা আমার অগোচরে রয়ে গেল। আমার বুঝার বয়স থেকে শুধু জানি এ নদীটির নাম রাইনখ্যং নদী বা রাইনস্যাংগাঙ। এ নদীর দু'পাশে গড়ে উঠেছে ছোট বড় অসংখ্য গ্রাম। গ্রাম গুলোকে দেখলে মনে হয় যেন মায়ের স্নেহে লালিত সন্তান। মা যেমন তার সন্তানকে অত্যন্ত স্নেহে লালন পালন করে, ঠিক তেমনি নদীটিও এ গ্রাম তথা মানুষগুলোকে লালন পালন করে আসছে। এখানকার প্রকৃতি, গাছ-পালা, পাহাড়-পর্বত, আবহাওয়া প্রভৃতির সাথে এখানকার আদিবাসীরা অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। যার ফলে, এখানকার আদিবাসীরা অত্যন্ত নম্র, ভদ্র ও সহজ সরল প্রকৃতির। হয়তো সরলতার কারণে এখানকার আদিবাসীরা প্রতিনিয়ত শোষণ আর নির্যাতনের শিকার হয়। শুনেছি আমার জন্মের আগে নাকি এখানে ছিল গভীর জঙ্গল, যেখানে ছিল বাঘ, ভাল্-ক আর বিভিন্ন হিংস্র জন্তুর ভয়, যা মানুষের বসবাসের অনুপযোগী ছিল। আর এখানকার আদিবাসীরা শত প্রতিকূল পরিবেশের সাথে যুদ্ধ করে পাহাড় পর্বত ডিঙিয়ে গড়ে তুলেছে এক একটি গ্রাম। রচনা করেছে বেঁচে থাকার মতো আবাস ভূমি। অথচ আজ ভাবতে বড় খারাপ লাগে এখানকার আদিবাসীরা কত অসহায়, কত অবহেলিত। নেই কোনো তাদের নিজস্ব ভিটে মাটি, নেই কোনো বাঁচার নিরাপত্তা। যা কিছু জায়গা জমি আছে সেগুলোও নাকি রিজার্ভ বা সংরক্ষিত বনাঞ্চলের অধীনে। কাজেই বলা যায়, এখানকার আদিবাসীরা বন বিভাগের করুনায় বেঁচে আছে। যে কোনো সময় বন বিভাগ আদিবসীদের আশ্রয়টুকু কেড়ে নিতে পারে। অথচ আমরা স্বাধীন দেশের নাগরিক। আর স্বাধীনতা আমাদের জন্মগত অধিকার।

এ স্বাধীনতা অধিকার আদায়ের জন্য এদেশের মানুষ বৃটিশ বিরোধী আন্দোলন থেকে শুরু করে পাকিস্তানী পাক হানাদার বাহিনীর সাথে যুদ্ধ করেছে। ছিনিয়ে এনেছে সবুজে সমারোহ লাল বৃত্ত সম্বলিত একটি স্বাধীন পতাকা। পৃথিবীর মানচিত্রে জায়গা করে নিয়েছে বাংলাদেশ নামে একটি নির্দিষ্ট ভূ-খণ্ডসহ একটি স্বাধীন রাষ্ট্র, ঠিক তেমনি এখানকার আদিবাসীরাও প্রকৃতি আর কত হিংস্র জীবজন্তুর সাথে যুদ্ধ করে গড়ে তুলেছে এখানকার গ্রাম। রচনা করেছে বেঁচে থাকার মতো আবাস ভূমি। তাহলে পার্থক্যটা কোথায় ?

সার্বভৌমত্ব, নির্দিষ্ট ভূ-খণ্ড ও স্বাধীনভাবে বাঁচার জন্য এদেশের মানুষ সংগ্রাম করেছে পাকিস্তানীদের বিরুদ্ধে। আর এখানকার আদিবাসীরাও নিরাপদে বাঁচার জন্য, শান্তিতে বসবাসের জন্য যুদ্ধ করেছে প্রকৃতি ও হিংস্র পশুদের সাথে। তা হলে আজ এখানে বাঁচার নিরাপত্তা কোথায় ? জীবনের শান্তি কোথায় ? আমি কিন্তু আমাদের দেশের স্বাধীনতাকে হেয় কিংবা ছোট করার জন্য এ মন্তব্যটি করিনি। আমাদের স্বাধীনতা তো আমাদের তথা দেশের গর্ব। আর স্বাধীনতার সাথে কিছুরই তুলনা করা যায় না। শুধু এখানকার আদিবাসীদের জীবনের প্রোক্ষাপট তুলে ধরার জন্য এ মন্তব্য আর তুলনা করা। অথচ স্বাধীন দেশের নাগরিক হয়েও এখানকার আদিবাসীরা আজও কতো পরাধীন। এখানে এত শাসন, এত আইন রয়েছে যা আমি আর কোথাও দেখিনা। উঠতে, বসতে, চলতে, খেতে সর্বদা আইন মানতে হয়। যেন এখানকার আদিবাসীরা জেলখানার সাজা প্রাপ্ত আসামী। কিন্তু কোনো প্রতিবাদ নেই। প্রতিবাদের ভাষা মানুষ খুঁজে পায় না, আর পেলেও প্রতিবাদ করার সাহস পায় না। এখানকার আদিবাসীদের একটা প্রবাদ আছে - সামনে গেলে বাঘের ভয়, আর পেছনে গেলে সাপের ভয়। ঠিক তেমনি এখানকার আদিবাসীদের প্রেক্ষাপট। শুধু এক জায়গায় চুপ করে বসে থাকা ছাড়া কিছুই করার নেই। তাহলে এরা সত্যি সত্যিই জেলখানার আসামী ? নাকি কোনো বহিরাগত শরণার্থী। এটা গবেষণা করার বিষয়। হয়তো বহিরাগত শরণার্থীদেরও এ রকম শাসন আর আইনের মধ্যে থাকতে হয় না।

মাঝে মাঝে যখন সময় পাই নানা–নানীর পাশে বসে প্রায়ই গল্প শুনি। নানা-নানী প্রায়ই সেই বৃটিশ সরকারের আমলের কথা বলেন। সে সময় নাকি পাঁচ টাকা দিয়ে ঢাকা শহরে ঘুরে আসা যেত। এক আনায় চার-পাঁচ কেজি চাল পাওয়া যেত। শুনলে কেবল হাসিই পায়। কেননা বর্তমান প্রোক্ষাপটে তা নিতান্তই কাল্পনিক বিষয়। তাছাড়া তাদের নাকি রেজিস্ট্রিকৃত অনেক জায়গা জমি ছিল, গোয়াল ভরা গরু, পুকুর ভরা মাছ আর গোলা ভরা ধান ছিল। মানুষের প্রতি মানুষ ছিল সহানুভূতিশীল। এক জনের বিপদে আর একজন পাশে এসে দাঁড়াত, তারা কতো সুখে ছিল। কিন্তু সেদিন আজ আর নেই। কাপ্তাই বাঁধের পানি তাদের সবকিছু কেড়ে নিয়েছে। তাদের জায়গা জমি বাঁধের পানির নিচে তলিয়ে গেছে। তারা আজ সর্বহারা। সেই সোনালী দিন আর ফেলে আসা বন্ধু-বান্ধবের স্মৃতি উচ্চারণ করে তারা আজ কেবল অশ্রু ফেলে। আমার নানু প্রায়ই বলতেন তাদের সেই জায়গাগুলো যদি থাকতো তাহলে তারা আজ এ অবস্থায় পড়তো না। কাজেই বুঝা যায় তারা আজকের এ স্বাধীনতাকে প্রত্যাশা করেনি। যে স্বাধীনতা তাদের জীবনের কোনো পরিবর্তন আনতে পারেনি, যেখানে তাদের শান্তিতে বাঁচার নিরাপত্তা নেই। শুধু আমার নানু নয়, আমার নানুর মতো অনেকেই আজ এ পরিস্থিতির স্বীকার। যাই হোক, বিংশ শতাব্দীতে পৃথিবীর অনেক কিছুর পরিবর্তন হলো। আনেক কিছুর আধুনিকায়ন হলো, শুধু পরিবর্তন হলো না এখানকার আদিবাসীদের জীবনচিত্র।

এতদিন বলা হতো পার্বত্য চট্টগ্রাম নাকি বাংলাদেশের মানচিত্রের বাইরে, যার কারণে দেশের বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা থেকে পার্বত্য চট্টগ্রামকে বঞ্চিত করে রাখা হয়েছে। সম্প্রতি বর্তমান সরকার মোবাইল নেটওয়ার্ক চালু করে সে দুর্নামতা কিছুটা মুছে দিয়েছে। হোকনা কেবল পৌর এলাকা পর্যন্ত সীমাবদ্ধ, তারপরও অন্ততপক্ষে গুটি কয়েক মানুষ যোগাযোগের

আধুনিক ছোঁয়া পাচ্ছে। কিন্তু ফারুয়ার আদিবাসীরা---- । এখানে নেই কোনো বিদ্যুৎ, নেই কোনো রাস্তাঘাট, নেই সুচিকিৎসার জন্য কোনো হাসপাতাল। বর্তমান বিশ্বে চিকিৎসা বিজ্ঞানের যথেষ্ট উন্নতি হলেও এখানে যে সরকারি স্বাস্থ্য কমপে-ক্সটা আছে তাও একটি ভূতের বাড়ির সমতুল্য। যেখানে নেই কোনো ডাক্তার, নেই কোনো ঔষধ, ফলে চিকিৎসার ক্ষেত্রে এখানকার আদিবাসীদের পাড়ি দিতে হয় শহরের কোনো এক হাসপাতালে, আর হাসপাতালে যাতায়াতের একমাত্র মাধ্যম হচ্ছে সেই চিরচেনা রাইনস্যং নদী। কাঠের তৈরি নৌকা বা বোটের মাধ্যমে রোগীকে শহরে নিয়ে যাওয়া হয় চিকিৎসার জন্য। অথচ নদীটি গ্রীষ্মকালীন সময়ে শুকিয়ে নৌকা চলাচলে অযোগ্য হয়ে পড়ে। যার ফলে অনেক রোগী বিনা চিকিৎসায় মারা যায়। আর এখানকার আদিবাসীরা দীর্ঘ ৪০ কিঃ মিঃ পথ পায়ে হেঁটে উপজেলা শহরের সাথে যোগাযোগটা বজায় রেখে চলে দিনের পর দিন। তাদের এ দুঃখের অভিযান যেন শেষ হবার নয়। কত বড় বড় নেতা এখানে এল আর গেল, আদিবাসীরাও তুলে ধরেছে তাদের চাওয়া পাওয়া আর সমস্যার কথা। তাঁরাও অনেক মিষ্টি মধুর বাণী শুনিয়ে গেছেন, যেগুলো শুনলে কলিজা জুড়িয়ে যেতো আদিবাসীদের। এখানকার সহজ সরল আদিবাসীরা আশার আলোর স্বপ্ন দেখতো তাদের বাণীতে। কিন্তু চলে যাওয়ার পর দেখা যেত 'পরের জায়গা পরের জমি' গানটির মতো। কোনো কিছুই হয় না। যাই হোক, পরিশেষে দিনের পরে রাত আসে, রাতের পরে দিন। দিনের সোনালী সূর্যের আলো পৃথিবীর সমস্ত কিছু আলোকিত করে দেয়। হয়তো একবিংশ শতাব্দীতেও পৃথিবীর অনেক কিছু পরিবর্তন হবে, অনেক কিছু আধুনিকায়ন হবে, কিন্তু এখানকার আদিবাসীদের জীবনের ভাগ্যাকাশে কোনো দিন সোনালী সূর্যটা উদয় হবে কিনা সন্দেহ। তাদের জীবনে আলো জ্বলবে কিনা ভাব্বার বিষয়। যদিও হয় তাহলে এখানকার আদিবাসীদের জন্য তা আশীর্বাদ হয়েই আসবে।

ছাত্র, রাঙামাটি সরকারি কলেজ।

আর কতদূর সে সময়?

অনুরাগ চাকমা

খাগড়াছড়ি, রাঙ্গামাটি, বান্দরবান– এই তিন পার্বত্য জেলাকে নিয়ে ৫০৯৩ বর্গমাইলের সবুজ ঢাকা মায়াবী অরণ্য জনপদ পার্বত্য চট্টগ্রাম। নিজ নিজ ঐতিহ্যের চৌদ্দটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাতিসত্তার প্রিয় আবাসভূমি। চেংগী-মাইনী-কাচালং-সাংগু-মাতামুহুরী কত নদীর; আলুটিলা-ফুরোমোন-কেওক্রডং কত পাহাড়ের প্রকৃতির সৌন্দর্যকে ঘিরে যে পাহাড়ি জনপদ– পার্বত্য চট্টগ্রাম দীর্ঘ দু'যুগের বেশি সশস্ত্র সংঘাত-সংঘর্ষে ক্ষত-বিক্ষত ছিল। সুদীর্ঘ এই সময়ে শান্তির পাহাড়ে কত রক্ত ঝরেছে; কত মা-বোনের অশ্রু ঝরেছে; কত যৌবন নীরবে ঝরেছে; কত জীবন অপহৃত হয়েছে; কত পাহাড়ি পল-ী ধ্বংস হয়েছে; কত শোকের মাতম নেমে এসেছে এসব মানুষের জীবনে; কত শোকের অনলে পুড়ে-পুড়ে ছাই হয়েছে এখানকার মানুষগুলোর স্বপ্ন। এ ছিল পার্বত্য চট্টগ্রামের অরণ্য জীবন যাকে দীর্ঘ দু'দশকের বেশি সময়ে একটি জলন্ত আগ্নেয়গিরি ছাড়া কিছু মনে হতো না।

আর ইতিহাসে কেন জনপদ বার বার অশান্ত হয়ে উঠে তার বস্তুনিষ্ঠ ও নিরপেক্ষ ব্যাখ্যা বিশে-ষণ তুলে ধরার আগে পার্বত্য চট্টগ্রামের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস পর্যালোচনা করা প্রয়োজন বলে বোধ করি। পার্বত্য চট্টগ্রামের উত্তরে ভারতের ত্রিপুরা রাজ্য, উত্তর-পূর্বে মিজোরাম রাজ্য, দক্ষিণ-পূর্বে আরাকান প্রদেশ এবং দক্ষিণ-পশ্চিমে কক্সবাজার ও চট্টগ্রাম জেলা। অখণ্ড ভারত উপমহাদেশে ব্রিটিশ শাসনামলে পার্বত্য চট্টগ্রাম 'Chittagong Hill Tracts Regulation Act-1900' এর অনুসারে দীর্ঘ সময় ধরে স্বশাসনে শাসিত ছিল। সে সময় এখানকার লোকেরা তাদের নিজস্ব প্রথা-আচার-আচরণ, রীতি-নীতির আলোকে নিজেদেরকে শাসন করতো। ১৯৪৭ সালের আগে এ অঞ্চলে বহিরাগতদের স্থায়ীভাবে বসবাসের অনুমতি ছিল না। ফলে বাঙালির সংখ্যা ছিল ২.০৫ ভাগ। ১৯৪৭ সালে উপমহাদেশে লর্ড মাউন্ট ব্যাটেনের ৩রা জুনের পরিকল্পনানুযায়ী বিভক্ত হয় এবং ভারত ও পাকিস্তান নামে দুটি রাষ্ট্রের জন্ম হয়। মুসলিম অধ্যুষিত অঞ্চল নিয়ে পাকিস্তান আর অমুসলিম অধ্যুষিত অঞ্চল নিয়ে ভারত ডোমিনিয়ন গঠিত হয়। সেই সূত্র ধরে অমুসলিম অধ্যুষিত অঞ্চল হিসেবে পার্বত্য চট্টগ্রাম ভারতে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাকে পাকিস্তানের অংশ হতে হলো। সাম্রাজ্যবাদী পাকিস্তানী শাসনের ১৩ বছরের মাথায় ১৯৬০ সালে কর্ণফুলী নদীর উপর কাপ্তাই বাঁধ নির্মাণ করা হয়। এ বাঁধ হওয়ার ফলে এ অঞ্চলের ৪০ শতাংশ আবাদযোগ্য জমি কর্ণফুলী নদীর পানিতে নিমজ্জিত হয় এবং মোট জনসংখ্যার ৬০ শতাংশ লোক বাস্তুচ্যুত হয়। পাকিস্তানী দুঃশাসনামলে পাহাড়িদের জীবনে এটাই প্রথম আঘাত আসল। অতঃপর ১৯৬৪ সালে পাকিস্তান সরকার 'Chittagong Hill Tracts Regulation Act-1900' বাতিল করে 'বিশেষ অঞ্চল' হিসেবে পার্বত্য চট্টগ্রামের মর্যাদাকে ভূলুণ্ঠিত করে। ১৯৭১ সালে এসে পাকিস্তানও ভেঙ্গে গেল। পৃথিবীর রাজনৈতিক মানচিত্রে স্বাধীন বাংলাদেশের আত্মপ্রকাশ ঘটে। আর এখন এ বাংলাদেশের অংশ পার্বত্য

চট্টগ্রাম স্বাধীনতার ২৩ দিনের মাথায় স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম সংসদের সংসদ সদস্য অ্যাডভোকেট মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার নেতৃত্বে। পাহাড়ি জনগণের একটি প্রতিনিধিদল স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম রাষ্ট্রপতি বঙ্গবন্ধুর নিকট চারদফা দাবিনামা প্রস্তাব করে। কিন্তু এতে কোনো সুফল হয়নি। বঙ্গবন্ধু পাহাড়ি জনগণের মনের কথা হৃদয় দিয়ে অনুভব করতে পারেননি বলেই তো তাদের প্রাণের দাবিগুলোকে গুরুত্ব না দিয়ে জুম্ম জনগণের লক্ষ লক্ষ জীবনকে উদ্দেশ করে লারমার প্রতি হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করে বলেছিলেন, 'আপনারা বেশি বাড়াবাড়ি করবেন না। প্রয়োজনে এক লাখ, দুই লাখ, তিন লাখ, চার লাখ, পাঁচ লাখ......দশ লাখ বাঙালি ঢুকিয়ে দিয়ে আপনাদেরকে উৎখাত করা হবে।' স্বাধীন বাংলাদেশের ইতিহাসে এ ছিল বঙ্গবন্ধুর সেদিনের অগণতান্ত্রিক বুলি, সাম্প্রদায়িক রাজনীতির ইঙ্গিত, শোষন-শাসনের আভাস, পাহাড়ের অস্তিত্ব নিশ্চিহ্ন করে দেয়ার জন্য সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদের বিকৃত রুচির প্রকাশ যা পাহাড় ও পাহাড়িদের অস্তিত্বের কঠিন প্রশ্নে পাহাড়ের নেতৃত্বকে চরমভাবে ভাবিয়ে তোলে আর সশস্ত্র জীবনের দিকে ঠেলে দেয়। তাই, আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার আদায়ের লক্ষ্যে ১৯৭৩ সালে ৭ই জানুয়ারিতে পাহাড়ি জনগণের 'শান্তিবাহিনী' নামে গেরিলা সংগঠনের আত্মপ্রকাশ ঘটে। আর অন্যদিকে পাহাড়িদের এই যৌক্তিক-ন্যায়ের সংগ্রামকে গলা টিপে হত্যা করার জন্য বাংলাদেশ সরকার অত্যাচার-নির্যাতনের পথ বেছে নেয়। যার ফলশ্রুতিতে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের সূচনা ঘটে।

২৫ বছরের বেশি এই দীর্ঘ সময়ে এ প্রাণসংহার খেলা কেড়ে নেয় ২০ হাজারের মত নিরীহ মানুষের জীবন। উদ্বাস্তু করে পাহাড়ের ৬৫ হাজার পাহাড়ি জনগণের জীবন যারা ১৯৮৬ সালের দিকে ছন্নছাড়া জীবন নিয়ে ভারতে শরণার্থী হিসেবে রাজনৈতিক আশ্রয় লাভ করে। এমন ধ্বংসের খেলায় অগ্নিসংযোগের ঘটনা ঘটেছে প্রায় ছয়শ'টি; অপহরণের সংখ্যার পরিমাণ ছিল দুই হাজারের অধিক; আর চৌদ্দকোটি জনসংখ্যার ভারে দারিদ্র্যপীড়িত এমন বাংলাদেশকে প্রতিদিন এ এলাকার জন্য ব্যয় করতে হয়েছিল এক কোটি টাকা। যা হিসাব করে সহজে অনুমান করা যেতে পারে যে, জাতি হিসেবে আমরা কত বিরাট ক্ষতির শিকার হয়েছি। ইতিহাসের এই সামান্য ভুলের জন্য জাতি আজ কোথায় গিয়ে দাঁড়িয়েছে? অথচ এমন ভয়াবহ বিরোধকে শান্তিপূর্ণ উপায়ে নিষ্পত্তি করার সৎ সাহস আর মহৎ উদ্যোগ দেখাতে পারেনি এদেশের জিয়া-এরশাদ-খালেদা সরকার। যদিও তারা লোক দেখানো হিসেবে পার্বত্য চট্টগ্রামের সমস্যা নিয়ে জনসংহতি সমিতির সাথে বৈঠকের পর বৈঠক করেছিল। তাই, তারা তাদের শাসনকে প্রগতিশীল, উদার, অসাম্প্রদায়িক, গণ উন্নয়নমুখী হিসেবে বিগত সময়ে দাঁড় করাতে পারে নি। বরং তারা নির্যাতন-অত্যাচারী সেই কালো হাতের জন্ম দিয়েছিল, যে একই হাত দিয়ে আমরা রুখে দিয়েছি ইতিহাসের সেই পাকিস্তানী দোসরদের কালো শাসন। সাম্রাজ্যবাদী পাকিস্তানী আমলের একই শোসন-বঞ্চনার চর্চা এরা অনুশীলন করলো স্বাধীন বাংলাদেশের অংশ পার্বত্য চট্টগ্রামে, ইতিহাসে আমরা বাংলাদেশী জনগণ যে একই শোষণ-বঞ্চনার যন্ত্রণা-বেদনা-কষ্টের শিকার হয়েছি আর মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে সে সবের কঠিন-কঠোর জবাব দিয়ে এ দেশ থেকে অন্যায়-অবিচারের অবসান ঘটিয়েছি। মোট কথা ১৯৯৬ এর আগ পর্যন্ত অশান্ত পাহাড়ে শান্তি আসেনি। তাই প্রায় বিংশ শতাব্দীর শেষেও বন্দুকের গর্জনে পাহাড়ের অরণ্য জীবন কেঁপে উঠত আশংকায় ও অনিশ্চয়তায়। উদ্বেগ-উৎকণ্ঠায় এখানকার মানুষগুলোকে প্রতিটি রজনী কাটাতে হতো। ভয় আর আতঙ্কে জীবনযাত্রা ছিল সীমিত গণ্ডির ভেতরে আবদ্ধ। রাতের

ঘুটঘুটে অন্ধকারে শান্তিবাহিনী আর সশস্ত্রবাহিনীর পদব্রজের শব্দে শত শত বাঙালি-পাহাড়ি গ্রামের ঘুম ভেঙ্গে যেত। পাহাড়ি জনপদের জীবনের এই যে অচলাবস্থা জাতীয় জীবনে এই যে ক্রান্তিকাল তা থেকে বের হয়ে আসা ছিল সময়ের দাবি।

১৯৯৬ সালের জাতীয় সংসদ নির্বাচনে গণরায় নিয়ে আওয়ামী লীগ যখন রাষ্ট্র ক্ষমতায় এল, তখন বাংলাদেশের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে যেমনি মৌলিক পরিবর্তনের ধারা রচিত হয়, পাহাড়ের দীর্ঘদিনের বিরাজমান সমস্যা সমাধানের জন্যও আলাপ-আলোচনার গতি প্রাণ পায়। সময়ের দাবির সাথে সাথে মানবতার স্বার্থে, শান্তির স্বার্থে, উন্নয়নে স্বার্থে অবশেষে জেএসএস ও সরকারের মধ্যে ১৯৯৭ সালের ২রা ডিসেম্বরে সম্পাদিত হয় 'পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তিচুক্তি'। পাহাড়ে নেমে আসে শান্তির ঝর্ণাধারা। শান্তির স্ে-াগান ও শান্তির বার্তায় মুখরিত হয় প্রতিটি পাহাড়ি জনপদ। তাই, দেশকে নিয়ে যারা ভাবে, চিন্তা করে, কাজ করে, সেসব প্রতিটি মানুষ শান্তিচুক্তিকে স্বাগত জানায়। দেশের বাইরে ও আন্তর্জাতিক অঙ্গনে এ চুক্তিকে অভিনন্দিত ও প্রশংসিত করে বিশ্বরাষ্ট্র সংগঠন জাতিসংঘ, ইউনেস্কো, ইউরোপীয় ইউনিয়ন। বিশ্ব জনমতকে এ চুক্তি যে আকৃষ্ট করে আর বাংলাদেশকে যে অন্যান্য সংঘর্ষে জর্জরিত দেশের জন্য একটি মডেল হিসেবে দাঁড় করায় জাপান, ভারত, আমেরিকা, ফ্রান্স, ব্রিটেনের চুক্তির প্রতি সমর্থন তো এটাই প্রমাণ করে। চুক্তি যে দেশে-বিদেশে জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল তা নিঃসন্দেহে বলা যায়। শান্তিচুক্তি সম্পাদনের প্রাক্কালে 'সেন্টার ফর ডেভেলপমেন্ট কমিউনিকেশন, ঢাকা' পক্ষ থেকে পার্বত্য সমস্যা ও শান্তিচুক্তি সম্পর্কিত যে একটি জনমত বিচারের জন্য জরিপ চালানো হয় তা প্রমাণ করে এ চুক্তি আসলে নিঃসন্দেহে পাহাড়ের মানুষের দীর্ঘদিনের লালিত স্বপ্নের বাস্তবায়ন। কেননা, জরিপে দেখা গেছে যে, তিন পার্বত্য জেলায় বসবাসরত উপজাতি ও অ-উপজাতির মধ্যে ৮৯.৭৩ শতাংশ নাগরিক শান্তিচুক্তি সমর্থন করেন। শান্তিচুক্তি বিরোধিতা করাকে আপনি যুক্তিসঙ্গত মনে করেন কিনা? এমন প্রশ্নের উত্তরে তিন জেলার উত্তরদাতাদের শতকরা ৮৯.২৮ ভাগ নাগরিক বলেছেন, শান্তিচুক্তি বিরোধিতা করার কোনো কারণ নেই। জরিপের ফলাফল থেকে এ সিদ্ধান্তে আসা যায় যে, এ চুক্তির পিছনে জনমত আছে। এ চুক্তিকে সর্বস্তরের মানুষ সমর্থন জানিয়েছে, সমাজে তার গ্রহণযোগ্যতা আছে। তাই এ চুক্তি গণমানুষের স্বার্থ রক্ষার চুক্তি। পাহাড়ি-বাঙালি একই জাতীয় সীমানার মধ্যে পাশাপাশি শান্তিতে বসবাস করার স্বীকৃতি। কিন্তু এ চুক্তির গ্রহণযোগ্য ও জনপ্রিয়তাকে ভালো চোখে দেখতে পারল না এদেশের গণবিরোধী, উগ্র ধর্মান্ধ, নীতি-আদর্শহীন কতিপয় বুদ্ধিজীবী এবং রাজনৈতিক গোষ্ঠী। তারা সমগ্র দেশবাসীর নিকট চুক্তির অপব্যাখ্যা করে পার্বত্য চট্টগ্রামের সমস্যাকে জিইয়ে রাখার জন্য অলিখিত চুক্তিবিরোধী একটি মিথ্যা, অন্যায়, অযৌক্তিক সংগ্রামের সূচনা ঘটায়। আর ভদ্র, দেশপ্রেমিক, দেশসেবক সেজে আজ দেশের সার্বভৌমত্ব ও অখণ্ডতার নামে ৯ই জুন, ১৯৯৮ সালে ঢাকা-পার্বত্য চট্টগ্রাম পর্যন্ত এক ঐতিহাসিক লং মার্চের আয়োজন করেছিল। তাদের এসব প্রতিবাদের কর্মসূচি ও কর্মকাণ্ডের স্বরূপ বিশে-ষণ করে আমি তাদেরকে পাকিস্তানী শাসনামলের ইতিহাসের আইয়ুব খান, ইয়াহিয়া খান, জুলফিকার আলী ভুট্টোদের মত মুখোশধারী, কাণ্ডজ্ঞানহীন, বিবেক-বুদ্ধিহীন বুদ্ধিজীবী হিসেবে মনে করি। এটা অপ্রিয় হলেও সত্য যে, পাকিস্তানের এসব বুদ্ধিজীবীদের কারণে কিন্তু পাকিস্তান রাষ্ট্র কাঠামে ৭১-এ ভেঙ্গে গিয়েছিল। এরাও আজকের দিনের চুক্তিবিরোধী বুদ্ধিজীবীদের মত 'পাকিস্তানের সার্বভৌমত্ব ও অখণ্ডতা' রক্ষার নামে

পাকিস্তানকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দিয়েছিল। তাই, পার্বত্য চট্টগ্রামের ইস্যুটি নিয়ে যখন 'সর্বদলীয় ঐক্য পরিষদ' অর্থাৎ 'বহিরাগত বাঙালি পরিষদ' আন্দোলনের ঘোষণা দেয়, তখন ইতিহাস আমাকে পাকিস্তানের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। আর আমি তখন আশ্চর্যিত, চিন্তিত, উৎকণ্ঠিত, আশঙ্কিত না হয়ে থাকতে পারি না। তাই দেশবাসীর কাছে এক গুরুত্বপূর্ণ বার্তা পৌঁছে দিতে চাই। দেশকে বিভেদ করার জন্য এরা যে ষড়যন্ত্র ও অপপ্রয়াস চালাচ্ছে, তার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ান। কঠিন-কঠোর হাতে রুখে দিন তাদের মানবতাবিরোধী সকল অপকর্মকাণ্ড।

ভোর হতে হতে আবার কুয়াশায় ঢাকা পড়ে সমগ্র আসমান। এ দৃশ্যের সাথে আমার পরিচয় ঘটে শীতের ভোরে যখন জানালার পাশে দাঁড়িয়ে প্রকৃতির সৌন্দর্য উপভোগ করতে যাই। কিন্তু আজ শীত নেই। বসন্ত এসেছে পৃথিবীতে। তবুও এ সময়ে আমার এ দৃশ্য দু'চোখে প্রায় ধরা পড়ছে। কিন্তু আজ তাকে প্রকৃতির মাঝে দেখিনা। তাকে দেখতে পাই পাহাড়ে পাহাড়িদের জীবনের ক্লান্ত-অবসন্ন আকাশে। ১৯৯৭ সালে সবাইকে জীবনের স্বপ্ন দেখিয়ে যে শান্তিচুক্তি সম্পাদিত হয়, সে চুক্তিকে আজ অপব্যাখ্যা করে গণতন্ত্র-উন্নয়ন-মানবতা-শান্তিবিরোধী কুচক্রী নেতৃত্ব দেশের অসচেতন অংশকে কাজে লাগিয়ে জন্ম দেয় 'সর্বদলীয় ঐক্য পরিষদ' নামে একটি সাম্প্রদায়িক বাঙালি সংগঠনের এবং পার্বত্য চট্টগ্রামের জনজীবনকে আরো এক সংঘাত-সংঘর্ষের দিকে ঠেলে দেয়। তাই চুক্তির পরও সংঘটিত হয় ১৯৯৯ সালে দীঘিনালা বাবুছড়ায়; ২০০১ সালে রামগড়ে এবং ২০০৩ সালে মহালছড়িতে পাহাড়ি-বাঙালির মধ্যকার সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামা। আজকের সমঅধিকার আন্দোলন ও তাদের যে চক্রান্ত ও ষড়যন্ত্র তা কারো অজানা নয়। মোট কথা, চুক্তির পরেও পাহাড়ে শান্তি আসেনি। পাহাড় এখনো অশান্ত। পাহাড়ের ভবিষ্যত এখনো অনিশ্চিত।

পরিস্থিতিকে চুক্তির পরেও অত্যন্ত জটিল বলে মনে হচ্ছে। কেননা, একদিকে সমঅধিকার আন্দোলনের নামে সেটেলার বাঙালিদের চুক্তি ও জুম্মবিরোধী কার্যকলাপ; সরকার কর্তৃক চুক্তির সুস্পষ্ট লংঘন; অন্যদিকে, জনসংহতি সমিতির আবারও সশস্ত্র জীবনে ফিরে যাওয়ার দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত। তাহলে সবার মনে একটা প্রশ্ন। কি হচ্ছে পাহাড়ের ভবিষ্যত? পার্বত্য চট্টগ্রাম ইন্দোনেশিয়ার দ্বিতীয় আচেহ প্রদেশ হচ্ছে না তো?

কবে হবে মানবতার উদয়? কবে আসবে গণতন্ত্রের বিজয়? কবে হবে ন্যায়ের প্রতিষ্ঠা? কবে আসবে পাহাড়িদের জীবনের অধিকার? আর কতদূরে সে সময়? এ সব প্রশ্ন আজ বিবেকের, মনুষ্যত্বের, মানবাত্মার।

তথ্যসূত্র:

১. পার্বত্য চট্টগ্রাম: শান্তিপ্রক্রিয়া ও পরিবেশ-পরিস্থিতির মূল্যায়ন, মেজর জেনারেল (অবঃ) সৈয়দ মোহাম্মদ ইব্রাহিম বীর প্রতীক;

২. জুম পাহাড়ে শান্তির ঝরণাধারা: ঐতিহাসিক পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তিচুক্তি, গ্রন্থনা ও সম্পাদনায়: নূহ-উল-আলম লেলিন।

লেখক: ছাত্র, শান্তি ও সংঘর্ষ অধ্যয়ন বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

আদিবাসী

প্রিয়দর্শী খীসা

ভূমির আদিম অধিবাসী আদিবাসী,
মাটি প্রকৃতির সাথে তার অবিচ্ছেদ্য সংযোগ,
তাই আদিবাসী স্রষ্টার সৃষ্ট জীবন্ত প্রকৃতি।
তরুলতা, পশুপাখি, শৈল পাদদেশে উচ্ছল স্রোতস্বিনী,
ঢেউ খেলানো দিগন্তবিস্তৃত গভীর নিবিড় শ্যামলিমা,
লতাগুল্মো, কুঞ্জ-কাননে লীলায়িত মদির ফুলহাস,
কুহু কূজন ভীড়ে হিল্লোলিত মলয় চন্দন মাধুরী,
ঘন বনশয়ন তলে তটিনীর ছলছল ছন্দোবদ্ধ মৃদু কলনাদ,
সবই আদিবাসীর অতুল অমল মনের উৎসর্জন।
শার্দুলে বিভব নেই,
বৈভবের প্রয়োজন নেই,
ক্ষিধে পেলে যে কোন কিছু একটা ধরে খায়।
তাই বলে তার শিকারের অভাব হয়নি কোনদিন।
আদিবাসীর জীবনেও সৌধ কিরীটির অভিলাষ নেই,
লেফাফা দুরস্তের নেই কোনো দুরপনেয় আকিঞ্চন,
শুধু প্রকৃতির দান হতে সামান্য জুম চাষ তার চাওয়া
যা আছে, তা সুখে ভোগ করা।
তাতে কিন্তু ঘন বন হয়নি উজাড়,
সভ্যতার আর উন্নয়নের উথলিত জোয়ারে নিবিড় বনশ্রেণী
যে ভাবে ধীরে ধীরে হয়ে গেল ছারখার।
আদিবাসী আজ বড় অসহায়
নেই কোনো আইনভিত্তিক নিশ্চয়তা।
আদিবাসী সমাজ হতে তাই আজ
কল্পনা চাকমা নেই, আলফ্রেড সরেন, গিদিতা রেমা,
লেবিনা হাউই, সেন্টু সাঙমা হারিয়েছে একে একে,
আদিবাসী কোনদিন পরাবলম্বী ছিল না,
দুর্গম ঘনবন ছিল তার অবাধ বিচরণ ক্ষেত্র,
ঔষধ-পথ্য, অন্ন-বস্ত্র, বাসস্থানের নিরাপদ সংস্থান,
প্রকৃতিদত্ত সংগ্রহশালা থেকে যতটুকু প্রয়োজন,
ততটুকু নিয়ে অবশিষ্টের প্রতি করেনি কোন লোলুপ কামনা,
প্রকৃতির বুকে ছড়ানো সাজানো সুন্দরের প্রতি
কোনদিন কখনও হয়নি নির্লজ্জ প্রলুব্ধ,
অতি নিষ্পাপ অকৃপণ মনে সযত্ন সুষম বণ্টনের নীতিতে

ফেলে গেছে, অন্যের প্রয়োজন মেটাবার সদিচ্ছায়,
অফুরান ফলমূল, ঔষধ-পথ্য, জুমের জঙ্গল,
বনে বনে বিটপে বিটপে নদীতট অববাহিকায়।
জীবনে জীবন মেলাবার প্রতিকূল পরিবেশে!
আদিবাসীদের উন্নয়নের উন্মাতাল জোয়ারে,
সংকুচিত হয়েছে আদিবাসীদের বিচরণ ক্ষেত্র, জঙ্গল
তৈরী হচ্ছে ইকোপার্ক, বনায়নের নামে হচ্ছে জবর দখল,
তাই হারিয়ে যাচ্ছে প্রকৃতির সম্পদ,
বিহঙ্গকূল, বন্য জীবজন্তু, নানা প্রজাতির বৃক্ষরাজি,
প্রকৃতি চলে গেছে বৈরী অবস্থানে,
অনাবৃষ্টি, অতিবৃষ্টিতে অভাবিতপূর্ব ক্ষতি সাধিত হচ্ছে,
খামারে, আঙিনায়, আবাদী জমিতে, শস্যের ক্ষেতে।
তথাপি আদিবাসীদের উন্নয়নে,
কোটি কোটি টাকার উন্নয়ন পরিকল্পনায়
বাজার উন্নয়ন, বাস-ট্রাক টার্মিনাল নির্মাণ,
রাস্তাঘাট নির্মাণ কাজের বহর দেখে
অতি সহজেই এই বোধ আসে যে,
জাতিসংঘের সার্বজনীন ঘোষণা পত্র অনুসারে
সমমর্যাদা আর অধিকারাধির ফলশ্রুতিতে
আদিবাসীরা আজ 'বনসাই' হয়ে গেছে,
টবে রেখে যদৃচ্ছা বসানো যায়।

পার্বত্য চট্টগ্রামের একজন বিশিষ্ট কবি ও সাহিত্যিক।

আমন চশা

চন্দ্রসেন তনৃচংগ্যা

ঘিন' মেরে ঘিন'   ইশা ইশা ঘিন'
দঅ শাস্তি দঅ   মনদক্ক বিন,
মে তমার আর   নাই ডরাবার
ন গুইজ্জ কেনা বয়–
ম পাপ্‌ফানি ওক খয় ।

পুরা আল' ঘর   ধনজন মর
হাত-টেঙ' গম   গ্যাত মহাবল ।
কদ' কিচ্ছু ভাই   থাক্কেয়্য কেভায়
তারে ন চাং ফিরিয়ায়
যে আল' দে অসহায় ।

ন চাংগে দিভুর   ন চাংগে রাইত
ন চাংগে তে হাড়   নেহিসে শাইত ।
তারে বানা ভাই   দিয়্যংগে দুঁড়ায়
ইত্তুগ ন দিনে বল
শিরাবা গুরি অচল ।

আল' বিলি মর   গাড়ি ঘর-ভাত
মুসুঙ' কধা দ   ন তুলং মাধাত ।
জুআত মদত   কদ' অকামত
ছিদি দিয়্যং টেঞাপুসা–
মুই আলুঙে অবুশা ।

ইক্কি হাবে মর   শুধা উয়্যে ঘর
যা আলাক আগে   ইক্কি ব্যাক পর ।
সি-ই মহাভুলে   শুইন্ন উবুরে
বোই আহং বানা গায়–
উলুং মুয়্য অসহায়!

'আত্মসমালোচনা'

মূলভাব ঃ আমাকে ঘৃণা করো, ইচ্ছে মত ঘৃণা করো । আমাকে শাস্তি দাও, মনেতে আঘাত করো । আমাকে ভয় পাওয়ার কিছুই নেই, তোমাদের প্রতিশোধ নিয়ে নাও যেন আমার পাপ ক্ষয়ে যায় ।

আগে আমার ঘরবাড়ি, গাড়ি-ঘোড়া, অর্থ-বিত্ত, লোকবল ছিল, আমার আত্ম অহংকারে দিনে-রাতে অন্যদের শোষণ করেছি, গরিব-দুঃখীদের সাহায্য করিনি বরং সাহায্য চাইতে এলে তাড়িয়ে দিয়েছি । মদ-জুয়া-নারীর পিছনে আমি প্রচুর অর্থ অপচয় করেছি । অবুঝের মতো ভবিষ্যতের কথা একটুও চিন্তা করিনি । হায়রে পোড়া কপাল! আজ আর আমার এসবের কিছু নেই । আমি আজ সর্বহারা হয়ে একাকী শূন্যে ভাসমান! আমাকে ঘৃণা করো, আঘাত করো, প্রতিশোধ নাও.......... ।

ছাত্র, রাঙ্গামাটি সরকারি কলেজ ।

আমাকে খুঁজো না তুমি

পুচনু মার্মা

আমাকে খুঁজো না তুমি বহুদিন, কতদিন আমিও
তোমায় খুঁজি নাকো।
তবুও একই নক্ষত্রের নীচে, একই আলো-পৃথিবীর
এই পারে আমরা দু'জনই এখনো যে যার মত করে
বেঁচে আছি।
পৃথিবীর সেই প্রাচীন ব্যাবিলন সভ্যতা, অশোকের
বিদর্ভ-নগর কবেই না ভেঙ্গে খান খান হয়ে
মহাকালের আর্বতে হারিয়ে গেছে।
আমাদের দু'জনার দু'টি প্রাণের সুন্দর একটি
ভালবাসার বন্ধনও কবেই না ভেঙ্গে যেতে যেতে
আজ ম্রীয়মাণ থেকে ম্রীয়মাণতর হয়ে যাচ্ছে ;
জ্যোছনা শোভিত রাতের ঐ দূর আকাশের বুকে
মিটমিট করে জ্বলতে থাকা অসংখ্য তারারাও
না একদিন সবে ঝরে পড়ে যেতে হয়।
'হয় নাকি? বলে দূর দিগন্তের পাশে
উদাস দৃষ্টিতে তাকিয়ে শুধায় 'আমাদের
দিন যে গেছে, একেবারেই কি গেছে?
কিছুই কি নেই বাকি ?

ছাত্র, ইংরেজি বিভাগ, জাহাঙ্গীর নগর বিশ্ববিদ্যালয়।

পার্বত্য মাতৃভূমি

মং এ.নু

রিনিঝিনি গোধূলী সন্ধ্যায়
প্রত্যহ প্রকৃতি নিয়মনীতিতে
হৃদয়ে ফিরে আসে বারে বারে
আমার প্রেয়সী জন্মভূমি তীরে
সূর্যাস্ত বেলায় সবুজ গ্রাম-গ্রামান্তরে।

আমি এ সবুজ শ্যামল মাতৃভূমিতে
অনন্তকাল ধরে বেঁচে থাকতে চাই,
মৃত্যু পরে আমি মাতৃভূমি দেশের
পার্বত্য মাটিতে মিশে যেতে চাই।
অন্য কোনো প্রার্থনা, চাওয়া-পাওয়া
নেই আর আমার অন্তরে।

আমি মিশে যাবো পার্বত্য মাটিতে
সকল পাহাড়ি হৃদয়ের অনুরাগে
অথবা অধিকার প্রতিষ্ঠার ন্যায্য দাবিতে।
আমার দেহ মনও মিশে যাবে
পার্বত্যবাসীর লাখো জনতার মাঝে।
মরণের পরেও আমি জন্ম নিতে চাই
পার্বত্য মাটিতে, সবুজ ঘাস আর ফুল হয়ে ॥

ছাত্র, রোয়াংছড়ি, বান্দরবান।

আদিবাসী

কসমিন চাকমা

আমরা আদিবাসী
আমরাও মানুষ
আমাদের অবহেলা করা
চলবে না।
আদিবাসীদের অবহেলা
আর সহ্য করা হবে না।
মোরা থাকব সবাই মিলেমিশে
করব না কোনো জাতি ভেদাভেদ
ন্যায়ের সাথে কাজ করব
অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াব,
আমরা আদিবাসী
আমরাও মানুষ।

ছাত্র, বাংলাদেশ সুইডেন পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট, কাপ্তাই, রাঙ্গামাটি।

যাবো না

উড়াল চাকমা (হিমু)

সবুজ এই পাহাড় ছেড়ে,
যাবো না কোথাও........
আদিবাসীদের ঐতিহ্যের মান দিয়ে
হে মহান সরকার আমাদের বাঁচাও।
মূলহীন তৃণলতার মতো
আমরা আছি তোমার কোলে
অবহেলার চোখে দেখো না মোদের,
আমরাতো মানুষই।
এই মানবতার মাঝে আমরা মানুষ হিসেবে জানি,
হে মহান সরকার.....
লুণ্ঠন করো না আদিবাসীদের পিতৃভূমি।
কেন এত অবিচার আমাদের প্রতি?
কেনইবা এত হানাহানি?
আমরাও তো মানুষ! যদিও হই ক্ষুদ্র জাতি।
সকল মানবের ন্যায় আমাদেরও আছে প্রতিভা
ফুটিয়ে তোলার সুযোগ দাও
উৎফুল্ল মনে বলো মোদের
সামনের দিকে এগিয়ে যাও।

ছাত্র, রাঙ্গামাটি সরকারি কলেজ।